প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি।

শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়,
এম, এ-প্রণীত

———ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা, কিন্তু কোথা পাব
(দীন আমি!) রত্নরাজি"———

মধুসূদন।

কলিকাতা,
২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বোড়ার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১৯।

মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি।

সাহিত্য মানুষের সৃষ্টি। সন্তানে যেরূপ পিতার প্রকৃতি প্রতিফলিত হইয়া থাকে, কোন জাতির সাহিত্যেও সেইরূপ সেই জাতির প্রকৃতি প্রতিবিম্বিত হয়। সেই জাতির প্রথম উদ্বোধন হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা, সুখ দুঃখ, উন্নতি অবনতির পরিচয় তদীয় সাহিত্যে পাওয়া যায় সেই জন্য কোন জাতির ইতিহাস লিখিতে হইলে প্রাচীন তাম্রশাসন, শিলালিপি প্রভৃতির আলোচনা যেরূপ প্রয়োজনীয়, উহার প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনাও সেইরূপ বা ততোধিক আবশ্যক; কারণ, তাম্রশাসন প্রভৃতিতে ব্যক্তিবিশেষের কোন একটি বা কোন এক সময়ের কার্য্যের পরিচয় মাত্র পাওয়া যায়, ও উহাদের মূলে প্রায়ই কোন রাজনীতিক উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। কাজেই উহাদের দ্বারা কোন ঐতিহাসিক ঘটনার কাল-নিরূপণের পক্ষে যেরূপ সহায়তা হয়, ইতিহাসের প্রধান উপাদান জাতীয় চরিত্রের পরিচয়-লাভে সেরূপ সুবিধা হয় না। এ বিষয়ে আমাদের প্রধান অবলম্বন জাতীয় সাহিত্য।

জাতীয় সাহিত্য জাতীয় ইতিহাস রচনার প্রধান অবলম্বন।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য প্রাচীন বাঙ্গালী চরিত্রের একটি সুন্দর ধারাবাহিক ইতিহাস। এ হিসাবে এই সাহিত্যের আলোচনা আমাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য। তাহার উপর, কেবল সাহিত্যের হিসাবেও ইহার এমন কয়েকটি গুণ আছে, যাহাতে

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনার আবশ্যকতা।

ইহার আলোচনায় প্রভূত শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করিতে পারা যায়।

নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি মোটামুটি আলোচিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা উক্ত সাহিত্যের আলোচনায় সামান্যমাত্র সাহায্য হইলেও ইহার উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

বর্ত্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্যে চণ্ডীদাসকে বাঙ্গালার আদি কবি ও ভারতচন্দ্রকে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের শেষ কবি বলিয়া ধরিয়া লইলে অন্যায় হইবে না। চণ্ডীদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের রচিত বলিয়া যে সকল বাঙ্গালা পুঁথি আবিষ্কৃত হইতেছে, সেগুলি কতদূর প্রাচীন ও কতদূর পরবর্ত্তী লেখকগণের দ্বারা মার্জ্জিত ও পরিবর্ত্তিত, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। প্রাচীন কবিগণের মধ্যে কেহ কেহ কৃষ্ণ কালী প্রভৃতি দেবদেবীগণের বিষয়ে পদাবলী বা তাঁহাদের মাহাত্ম্য-প্রখ্যাপক উপাখ্যান সকল রচনা করিয়াছেন, কেহ কেহ সংস্কৃত কাব্য পুরাণাদির আখ্যায়িকা অবলম্বনে কাব্য প্রণয়ন, করিয়াছেন, এবং কতকগুলি কবি চৈতন্যের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। পদাবলীপ্রণেতৃগণের মধ্যে চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস রামপ্রসাদ প্রভৃতি, উপাখ্যান-রচয়িতৃগণের মধ্যে মুকুন্দরাম, রামেশ্বর, কেতকাদাস, ঘনরাম, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি, পুরাণাদি অবলম্বনে কাব্য-প্রণেতৃগণের মধ্যে কৃত্তিবাস, কাশীদাস প্রভৃতি, এবং চৈতন্য-চরিত-লেখকগণের মধ্যে বৃন্দাবনদাস, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি কবিগণই সমধিক প্রসিদ্ধ।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের আখ্যান বস্তু।

এই সকল কবির কাব্য পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, কোন দেব বা দেবীর চরিত্র অবলম্বনে তাঁহাদের প্রত্যেকের কাব্য রচিত। চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি কবিগণ রাধাকৃষ্ণের

প্রেমের বর্ণনা করিয়াছেন ; রামপ্রসাদ কালী-বিষয়ক পদাবলী প্রণয়ন করিয়াছেন ; কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত রাম ও কৃষ্ণের লীলা ও মাহাত্ম্য বর্ণনায় পূর্ণ ; মুকুন্দরাম চণ্ডীর, রামেশ্বর শিবের, কেতকাদাস মনসার, ঘনরাম ধর্ম্মের, ও ভারতচন্দ্র অন্নদার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন, আর চৈতন্য-চরিতাখ্যায়কগণ চৈতন্যকে কৃষ্ণের অবতাররূপে বর্ণনা করিয়া কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। মোট কথা, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, মনসা প্রভৃতি দেবদেবীগণের মাহাত্ম্য-বর্ণনাতেই পরিপূর্ণ।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরবের যুগ।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীই প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অতি গৌরবের যুগ। প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যই এই শতাব্দীদ্বয়ের কোন না কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল। চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিগণের পদাবলী, বৃন্দাবনদাস, কৃষ্ণদাস, লোচনদাস প্রভৃতি কবিগণের চৈতন্যচরিত সকল, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাসের রামায়ণ ও মহাভারত, কবিকঙ্কণের চণ্ডী—সমস্তই এই সময়ে রচিত। তখন বাঙ্গালাদেশে মুসলমান-শাসনের পূর্ণ প্রভাব। এরূপ মুসলমান-প্রাধান্যের মধ্যে হিন্দু সাহিত্যের এই উন্নতি আপাতদৃষ্টিতে বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয়। ইংরাজী সাহিত্যের জনৈক ইতিহাস-লেখক পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যের দৈন্যের কথায় লিখিয়াছেন,—

"The middle of the fifteenth century witnessed the expulsion of the English from France, and a time of national humiliation is unfavourable to the production of poetry. If, indeed, humiliation

become permanent, and involve subjection to the stranger, the plaintive wailings of the elegiac Muse are naturally evoked. But where a nation is merely disgraced, not crushed, it keeps silence, and waits for a better day." (Arnold : Manual of English Literature.) অর্থাৎ, কোন জাতির অবনতি বা অবমাননার কাল কাব্যরচনার অনুকূল নহে। এই অবনতি বা অবমাননা বৈদেশিকের অধীনতা জনিত ও স্থায়ী হইলে, সেই জাতির সাহিত্যে দুঃখের কবিতারই উদ্ভব হয়; কিন্তু কোন জাতি পরাধীন না হইয়া কেবলমাত্র অপমানিত হইলে, নীরবে সুদিনের অপেক্ষা করে।

জাতীয় অবনতির সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি। ইহার কারণ।

কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে আমরা এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। তাহার কারণ, বহুকাল একত্র অবস্থান করিয়া হিন্দু মুসলমান ক্রমশঃ পরস্পর-বিরোধ ত্যাগ করিয়াছিলেন; মুসলমান তখন আর বৈদেশিক নহেন, ভারতবর্ষে বাস করিয়া তিনিও ভারতবাসী হইয়াছেন। তাঁহার শাসন হিন্দুর নিকটে আর কঠোর বৈদেশিক শাসন বলিয়া বিবেচিত হইত না। তখন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে গ্রাম-সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া সৌহার্দ্দবন্ধন ক্রমশঃ দৃঢ় হইতেছিল। কাজি সাহেব চৈতন্যদেবকে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে এই সৌহার্দ্দের অনেকটা আভাস পাওয়া যায়ঃ—

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রীতির ভাব।

"গ্রাম-সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় আমার চাচা।
দেহ সম্বন্ধ হইতে গ্রাম-সম্বন্ধ সাঁচা॥

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥"

(চৈতন্য-চরিতামৃত)

এই জন্য আমরা দেখিতে পাই, মুসলমান শাসনকর্ত্তা হিন্দু কবিকে মহাভারতাদি হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থ রচনায় উৎসাহ দিতেছেন, ও হিন্দু কবি সেই রাজ-সম্মানে যৎপরোনাস্তি গৌরব অনুভব করিতেছেন।

জাতীয় ভাবের অভাব।

আর এক কথা। ইংরাজী শিক্ষার ফলে আমরা জাতীয় ভাব নামক যে পদার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতেছি, প্রাচীন বাঙ্গালীর হৃদয়ে সে ভাবের বিন্দু-বিসর্গ কখনও প্রবেশ করে নাই। এখনকার মত তখন পথ ঘাট সুগম ছিল না, তাড়িত বার্ত্তাবহ ও সংবাদপত্রের সৃষ্টি হয় নাই; এক প্রদেশের লোক সহজে অন্য প্রদেশে যাইতে পারিত না; এক প্রদেশের সংবাদ সহজে অন্য প্রদেশে আসিয়া পৌঁছিত না। এরূপ অবস্থায় জাতীয় ভাবের উৎপত্তি অসম্ভব। সাধারণ বাঙ্গালী নিজের গ্রামের বা আশ-পাশের দুই চারি খানি গ্রামের সংবাদ-মাত্র রাখিতেন। নিজের গ্রামস্থ বা দলস্থ লোকের উপকারের জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন; কোন পর্ব্ব বা উৎসব উপলক্ষে সকলে একত্র মিলিত হইয়া প্রাণ খুলিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিতেন, সময়ে সময়ে প্রাণ খুলিয়া পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদও করিতেন। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। তখনকার সাধারণ হিন্দুর সহানুভূতি তাঁহার পরিচিত গ্রাম বা ব্যক্তিবর্গের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত; সেই গণ্ডীর বাহিরে যাইতে পারিত না। সমগ্র হিন্দুসমাজের কথা তিনি মনে ধারণা

করিতে পারিতেন না। কাজেই জাতীয় অবমাননা বা অবনতি বলিলে আমরা যাহা বুঝি, তিনি তাহা বুঝিতেন না। এই জন্য প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে জাতীয়-ভাবোদ্দীপক বা জাতীয়-অবনতি জনিত খেদসূচক কবিতার একান্ত অভাব।

হিন্দুর অদৃষ্টবাদিতা ও ধর্ম্মপ্রাণতা।

তাহার উপর, হিন্দু ঘোরতর অদৃষ্টবাদী ও পরকালের উপর নিতান্ত বিশ্বাসবান্। হিন্দু ধর্ম্মপ্রাণ জাতি, তাঁহার জীবনের সকল কার্য্যেরই এক লক্ষ্য ধর্ম্ম। তিনি ঐহিক জীবনের সুখ দুঃখ অনিত্য বলিয়া বুঝিতে শিখিয়াছেন। তাই হিন্দু ইহ-জীবনে সহস্র বিপজ্জালে জড়িত হইয়াও এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতেন—

"এই মত কাল-গতি কেহ কারো নহে।
অতএব সংসার অনিত্য বেদে কহে॥
ঈশ্বরের অধীন সে সকল সংসার।
সংযোগ বিয়োগ কে করিতে পারে আর॥
অতএব যে হইল ঈশ্বর-ইচ্ছায়।
হইল সে কার্য্য, আর দুঃখ কেন তায়॥"

(চৈতন্য-ভাগবত।)

হিন্দুর এই কষ্ট-সহিষ্ণুতা ইউরোপীয়দিগকেও চমৎকৃত করিয়াছে। ঐহিক জীবনের দুঃখ কষ্ট এইরূপে সহ্য করিতে পারিতেন বলিয়া, প্রাচীন বাঙ্গালী হিন্দু কবি ঘোর দুর্দ্দিনেও নিশ্চিন্তমনে বাগ্দেবীর আরাধনায় মনোযোগী হইতে পারিয়াছিলেন।

কিন্তু ইহা বলিলেই সকল কথা বলা হইল না। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে হিন্দুদেবদেবীর চরিত্রই বর্ণনীয় বিষয় কেন হইল, তাহার উত্তর ইহাতে পাওয়া যায় না। ইহার একটি উত্তর আমরা সহজেই দিতে পারি। যে কবির জীবনের চরম উদ্দেশ্য ধর্ম্ম, তাঁহার পক্ষে আরাধ্য দেবদেবীর চরিত্র আলোচনা দ্বারা পুণ্যসঞ্চয়ের চেষ্টা করাই স্বাভাবিক। তাহার উপর যদি এরূপ কাব্যপ্রণয়নের দ্বারা ইহকাল পরকাল—উভয় কালেই লাভের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সেরূপ কাব্যপ্রণয়নের উদ্দেশ্য বুঝিবার পক্ষে কোন কষ্টই হয় না। চণ্ডী, মনসা, শীতলা প্রভৃতি দেবীগণের পূজা তখন বাঙ্গালাদেশে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল, ও সেই সকল পূজা বিশেষ লাভজনকও ছিল। চৈতন্য-ভাগবতের বৈষ্ণব কবি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে দেবদেবীর চরিত্র বর্ণিত হইবার কারণ।

দেবদেবীর চরিত্রালোচনায় ইহকাল পরকাল—উভয় কালেই লাভ।

"ধর্ম্মকর্ম্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধনে॥
ধন নষ্ট করে পুত্র-কন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥"

আর এক স্থলে চৈতন্যদেব খোলা-বিক্রেতা দরিদ্র শ্রীধরকে উপহাস করিয়া বলিয়াছেন—

"প্রভু বলে - শ্রীধর তুমি যে অনুক্ষণ।
'হরি হরি' বল, তবে দুঃখ কি কারণ?

লক্ষ্মীকান্ত সেবন করিয়া কেন তুমি।
অন্নবস্ত্রে দুঃখ পাও কহ দেখি শুনি॥
শ্রীধর বলেন—উপবাস ত না করি।
ছোট হউ', বড় হউ', বস্ত্র দেখ পরি॥
প্রভু বলে—দেখিলাম গাঁঠি দশ ঠাঁই।
ঘরে বোল, এই দেখিতেছি খড় নাই॥
দেখ এই চণ্ডী, বিষহরিরে পূজিয়া।
কে না ঘরে খায় পরে সব নগারিয়া॥"

(চৈতন্য-ভাগবত)।

প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যসমূহের অধিকাংশই কোন না কোন দেব-দেবীর পূজোৎসবের সময় চামর-মন্দিরাদি সহযোগে গীত হইত, এবং প্রত্যেক কবিই স্বীয় কাব্য এক এক দিনের গীতের উপযোগী কতকগুলি পালা বা অংশে বিভক্ত করিতেন।

সংস্কৃত সাহিত্যের অনুকরণ।

এ ভিন্ন আর একটি উত্তর আছে, তাহাই প্রধান বলিয়া আমাদের মনে হয়। তাহা এই—সংস্কৃত সাহিত্যের অনুকরণ। প্রায় প্রত্যেক প্রধান সংস্কৃত কাব্যেরই নায়ক-নায়িকা হয় দেব-দেবী, না হয় দেব-দেবীর অংশসম্ভূত মানব-মানবী। পুরাণে এই দেব-দেবী-প্রসঙ্গের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সকল সংস্কৃত কাব্য ও পুরাণ টোলে পড়ান হইত, কথকেরা এ সকল পুরাণপ্রসঙ্গের ব্যাখ্যা ও গানের দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করিতেন। এইরূপে পুরাণের কথা, এবং রামায়ণ ও মহাভারতের কথা অতি নিকৃষ্ট জাতিগণের মধ্যেও প্রচলিত হইয়াছিল। এই সকল পুরাণপ্রসঙ্গ একদিকে যেরূপ

চিত্তাকর্ষক, অন্যদিকে সেইরূপ শিক্ষাপ্রদ। এই শিক্ষা লাভ করার জন্য, এখনও বাঙ্গালার অতি নীচ জাতিগণ সুসভ্য ইউরোপের নিম্ন-শ্রেণীর লোকদিগের অপেক্ষা অধিকতর ধার্ম্মিক ও সচ্চরিত্র।

প্রাচীন বাঙ্গালা-কবিগণ সংস্কৃত সাহিত্যের এই প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের অনেকে সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। যাঁহারা সংস্কৃত জানিতেন না, তাঁহারাও কথকাদির মুখে পুরাণাদি শ্রবণ করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক ভাব ও অনেক সংস্কৃত শব্দ আয়ত্ত করিয়া লইতেন। সংস্কৃত দেশপূজ্য দেবভাষা—গ্রন্থরচনার ভাষা; আর বাঙ্গালা তখন পণ্ডিতগণের নিকটে গ্রাম্য কথনীয় ভাষা বলিয়া বিবেচিত হইত। সাধারণের ভাষা বলিয়া বাঙ্গালাকে অনেকে প্রাকৃত ভাষা বলিতেন। বাঙ্গালা ভাষায় রচিত গ্রন্থ পণ্ডিতগণের নিকট অনাদৃত হইত ও প্রামাণিক বলিয়া বিবেচিত হইত না। এই কারণে বাঙ্গালা-কবিরা তাঁহাদের রচনা পণ্ডিত-গ্রাহ্য ও প্রামাণিক করিবার জন্য তাহাকে যতদূর সম্ভব সংস্কৃতানুসারিণী করিতেন, ও তাহার উপকরণ যে সংস্কৃত-সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে গৃহীত, তাহা পদে পদে জানাইতেন। আর এক কথা, সর্ব্বদেশীয় সাহিত্যের প্রথমাবস্থায় তাহাকে কোনও উচ্চতর সাহিত্যের আদর্শে গঠিত করিবার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজী সাহিত্যের প্রথমাবস্থায় তাহাতে লাতিন ও ইতালীয় সাহিত্যের আদর্শ অনুসৃত হইত। সুতরাং যে বাঙ্গালা ভাষার সহিত সংস্কৃতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা যে সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শে গঠিত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

প্রায় সকল প্রাচীন বাঙ্গালা-কবিই তাঁহাদের গ্রন্থে পুরাণের দোহাই দিয়াছেন। কবিকঙ্কণ বলিয়াছেন—

ব্যাসমুনি রস গাওয়ে তুয়া,
নিবেদি তুয়া চরণে।
চণ্ডীর চরিত রচিয়া সঙ্গীত
দেবকী-নন্দন ভণে॥"—(চণ্ডী)

শিবরামের যুদ্ধের কবি কবিচন্দ্র গ্রন্থশেষে লিখিতেছেন—

"ব্যাসের আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥"

কবি ঘনরাম এক অদ্ভুত পুরাণ হইতে তাঁহার কাব্যের উপকরণ-সংগ্রহের কথা বলিয়াছেন; তাহার নাম ও রচয়িতা উভয়ই অদ্ভুত :—

"শুন সবে সমাদরে যুগে যুগে ঘরে ঘরে
করিত ধর্ম্মের আরাধনা।
এবে হৈল ঘোর কলি, যুগধর্ম্মে ধর্ম্ম বলি
পাছে কেহ না করে মাননা॥
আপনি ঠাকুর চিতে এত ভাবি পৃথিবীতে
পূজা ল'য়ে বাড়াতে প্রভাব।
ভাবনা করেন—কেবা কালে প্রকাশিবে সেবা
লবে কেবা চতুর্ব্বর্গ লাভ॥
দেখি এত ভাব্যমান, কাছে ছিল হনুমান্
হাকন্দ-পুরাণ বিজ্ঞবর।
নিবেদিল যোড় করে, কলিকালে ঘরে ঘরে
হবে ধর্ম্ম-পূজার আদর॥"—(ধর্ম্মমঙ্গল)

বাঙ্গালী হিন্দুর উপর এই পৌরাণিক আখ্যায়িকা সকলের কি যে এক আকর্ষণী শক্তি আছে, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালা কাব্য সকলও এই পৌরাণিক ভিত্তির উপর নির্ম্মিত। রঙ্গলাল রাজস্থানের ঐতিহাসিক ঘটনা সকল অবলম্বনে কাব্য রচনা করিয়া এক নূতন পথ আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে বিষয়ে সফলকাম হইতে পারেন নাই। শেষে তিনি কালিদাসের কুমারসম্ভবের অনুবাদে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। মাইকেলের তিলোত্তমাসম্ভব, মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা, হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার, দশমহাবিদ্যা, নবীনচন্দ্রের রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, প্রভৃতি কাব্য সকল পৌরাণিক প্রসঙ্গ অবলম্বনে রচিত। প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে দেবদেবীগণের চরিত্রবর্ণনার কারণ এক্ষণে বুঝিতে পারা যাইবে।

বাঙ্গালী কবিগণের এই সংস্কৃত-সাহিত্যানুকরণের ফলে বাঙ্গালা সাহিত্যের লাভ লোকসান দুইই হইয়াছিল। আমাদের মনে হয়, লাভের অপেক্ষা বরং ক্ষতির ভাগই অধিক হইয়াছে।

সংস্কৃত সাহিত্যের অনুকরণে বাঙ্গালা সাহিত্যের লাভ।

লাভ হইয়াছে এই যে, বাঙ্গালা ভাষা প্রাচীন কাল হইতেই মার্জ্জিত হইয়াছে। যে Chaucerকে ইংরাজেরা গর্ব্ব করিয়া "the well of English undefiled" বলিয়া থাকেন, তাঁহার ভাষা পরবর্ত্তী কালের ইংরাজগণ বুঝিতে কষ্ট বোধ করিতেন। এমন কি, সাধারণ পাঠকের পক্ষে সুগম করিবার জন্য Pope, Chaucerএর কয়েকখানি কাব্য, তাঁহার সময়ে প্রচলিত ইংরাজী ভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। কিন্তু

যে সময়ে ইংলণ্ডের আদি কবি, খাস-লণ্ডনবাসী Geoffrey Chaucer——

"A frere ther was, a wantown and merye,
A limitour, a ful solempne man ;
In all the ordres foure is noon that can
So moche of daliaunce and fair langage ;"

ইত্যাদি Anglo-Saxon-Latin-French মিশ্রিত অদ্ভুত ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন, প্রায় সেই সময়েই বাঙ্গালার আদি কবি চণ্ডীদাস সুদূর পল্লীগ্রামে, ইতর লোকের মধ্যে বাস করিয়া, গাহিতেছিলেন –

"বঁধু, কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে, জনমে জনমে
প্রাণনাথ হ'ও তুমি॥
ভাবিয়াছিলাম— এ তিন ভুবনে
আর মোর কেবা আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে॥
এ কুলে ও কুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল পায়॥"

সাহিত্যের প্রথম অবস্থায় এরূপ মার্জ্জিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাষা বাঙ্গালা ভিন্ন অন্য সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয় না।

স্বীকার করি, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে এরূপ মার্জ্জিত ভাষা সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। প্রত্যেক প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে পাশাপাশি দুই প্রকার ভাষা দেখিতে পাওয়া যায়, এক—মার্জ্জিত সাধুভাষা ; অপর—চলিত গ্রাম্য ভাষা। ইহার কারণ আছে। যেখানে কোন দেবতার স্তব, রূপবর্ণনা বা কোন উচ্চভাবের বর্ণনা করিবার আবশ্যক হইত, কবিগণ সে স্থানে ভাষা বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতেন। সে সকল স্থলে সাধুভাষা ভিন্ন কখনও গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার করিতেন না। তাঁহারা হয় মনে করিতেন, এ সকল স্থলে গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার করিলে দেবদেবীগণের অবমাননা করা হইবে, অথবা বর্ণনীয় উচ্চ বিষয়ের যথাযথ বর্ণনা হইবে না। তাহার উপর, পুরাণাদি সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে ঐ সকল বিষয়ের বর্ণনা অবিরত পাঠ করিয়া বা লোকমুখে শুনিয়া উহা তাঁহাদের এরূপ অভ্যস্ত হইয়া যাইত, যে প্রয়োজন হইলে সেই ভাষা স্বতঃই তাঁহাদের লেখনীমুখ হইতে নির্গত হইত। লঘু ব্যাপারের বর্ণনায় ভাষা বিষয়ে সাবধান হওয়া তাঁহারা প্রয়োজন মনে করিতেন না, ও সে বিষয়ে সংস্কৃত সাহিত্য হইতেও কোন সাহায্য পাইতেন না। কাজেই এরূপ স্থলে চলিত গ্রাম্য ভাষাই ব্যবহৃত হইত।

প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে দুই প্রকারের ভাষা।

গুরু বিষয়ের বর্ণনায় সাধু ভাষার ও লঘু বিষয়ের বর্ণনায় গ্রাম্য ভাষার ব্যবহার।

বিকঙ্কণ, চণ্ডীর রূপ বর্ণনার সময় লিখিতেছেন—

"সুচারু নিতম্ব সাজে, চরণ-পঙ্কজে রাজে
মণিময় কাঞ্চন নূপুর।

বিমল অঙ্গের আভা নানা অলঙ্কারে শোভা
রবির কিরণ করে দূর॥
ত্রিবলি-বলিত মাঝে সুবর্ণ-কিঙ্কিণী সাজে,
উরুযুগ রম্ভার সমান।
জিনিয়া কুঞ্জর-কুম্ভ কুচযুগ ধরে দম্ভ,
নেতের বসন পরিধান॥
মুখচন্দ্র অনুপাম, বিন্দু বিন্দু শোভে ঘাম,
সিন্দূর-তিলক তিমিরারি।
অধর বিদ্রুমদ্যুতি, তাম্বূলের রাগ তথি
নাসায় মাণিক মনোহারী॥" (চণ্ডী)

উপরি-উদ্ধৃত কাব্যাংশে দুই একটি শব্দ ভিন্ন প্রায় সকল শব্দই সংস্কৃত। কিন্তু ব্যাধপত্নী অভাগিনী ফুল্লরার—

"আচ্ছাদন নাহি, অঙ্গে পড়ে মাংস জল।
কত মাছি খায় অঙ্গে মোর কর্ম্মের ফল॥
নিয়োজন কৈল বিধি সবার কাপড়।
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়॥
হরিণ বদলে পাইনু পুরাণ খোসলা।
নড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধূলা॥" (চণ্ডী)

সাধু ধনপতির বিবাহে—

"দিনপতি গণপতি পূজিলেন প্রজাপতি
অধিবাস প্রতি গ্রহগণে।
পাতিয়া মন্থন যষ্টি সভাজন কৈল ষষ্ঠী,
পূজা কৈল মুকুন্দ-নন্দনে॥

দ্বিজে করে বেদগান, মহী গন্ধ শিলা ধান
দূর্ব্বা পুষ্প ঘৃত ফল দধি।
রজত দর্পণ হেম স্বস্তিক সিন্দূর ক্ষেম
কজ্জল গোরোচনা বিধি॥" (চণ্ডী)

কিন্তু জামাতাকে কন্যার বশীভূত করিবার জন্য যখন শ্বশ্রূঠাকুরাণী বশীকরণ ঔষধ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, তখন—

"ঔষধ করিতে রম্ভা ফিরে বাড়ী বাড়ী।
দোছটি করিয়া পরে বার হাত শাড়ী॥
কাটা মহিষের আনে নাসিকার দড়ি।
দুর্গার প্রদীপ পুতি রেখেছিল চেড়ী॥
আনিল কাকড়ি গাছ হারি আমলাতি।
আকুল কুন্তল করি আনে মধ্য রাতি।
সাপের আঁটুলি আনে বাদিয়ার ঘরে।
রোহিত মৎস্যের পিণ্ড মঙ্গল বাসরে॥" (চণ্ডী)

কবি রামেশ্বর মশকের বর্ণনায় হিতোপদেশের—

"প্রাক্ পাদয়োঃ পততি খাদতি পৃষ্ঠমাংসং
কর্ণে কলং কিমপি রৌতি শনৈর্বিচিত্রম্।
ছিদ্রং নিরূপ্য সহসা প্রবিশত্যশঙ্কঃ
সর্ব্বং খলস্য চরিতং মশকঃ করোতি॥"

এই শ্লোকের অনুকরণে—

"শ্যামবর্ণ স্বর্ণ-রেখা-শোভন শরীর।
খলের লক্ষণে খাবে করিবে অস্থির॥
কাণে কাণে কুণু কুণু করিয়া সম্ভাষ।
পায় পড়ি, পশ্চাৎ পৃষ্ঠের খাবে মাস॥" (শিবায়ন)

লিখিলেন। কিন্তু মশা যখন—

"নির্ভরে নির্ভয় হ'য়ে মারিল কামড়।
চমকিয়া চন্দ্রচূড় চালাইল চড় ॥
ঠস্ ঠাস্ ঠুই ঠাই ঠাকুরের করে।
দশ পাঁচ উড়ে যায় দুই চারি মরে ॥
কট্ কট্ কেটে কোটি কোটি দেয় ভঙ্গ।
ফুরাবার নয় কিন্তু ফুলালেক অঙ্গ ॥
বাড় বাড় করে ভীম বাপ্ বাপ্ বল্যা।
কামড়ে কাতর হ'য়ে কাঁদে দুটি ছেল্যা ॥
হাঁটু পাতি বুড়া এঁড়ে ব'সে গেল পাঁকে।
ঠাই জানি ঠেঁটা কাক ঠোক্‌রায় তাকে ॥
আসিয়া চণ্ডনে মাছি বসিলেক ঘায়।
মাচ্ছেতা পড়িবামাত্র কৃমি হৈল তায় ॥
রক্ত পাড়ে দাঁড় কাকে গাঢ় ক'রে খেয়ে।
হোগলের বনে বৃষ লুকাইল গিয়ে ॥" (শিবায়ন)

আর উদাহরণ তুলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতেই দেখা যাইবে যে, কাব্যে ব্যবহৃত গ্রাম্য চলিত ভাষাও নিতান্ত ছোট লোকের ভাষার মত ছিল না। গ্রাম্য শব্দগুলি বাদ দিলে ইহা প্রায় সাধুভাষার মতই শুনায়।

স্কচ্ কবির কাব্যে সাধুভাষা ও চলিত ভাষার ব্যবহার।

সাধুভাষা ও চলিত ভাষার এইরূপ পাশাপাশি প্রয়োগ আমরা স্কচ্ কবিগণের কাব্যেও দেখিতে পাই। স্কচ্ ভাষার অপেক্ষা ইংরাজী ভাষা অধিকতর মার্জ্জিত ছিল; এই জন্য স্কচ্ কবিগণ গুরু-ভাব প্রকাশের জন্য প্রায়ই ইংরাজী ভাষা

ব্যবহার করিতেন ; লঘুভাবপ্রকাশে স্কচ্ ভাষাই ব্যবহৃত হইত। কবি Burns-এর যখন প্রাণের ফোয়ারা খুলিয়া গিয়াছে, তখন তিনি—

"There's news, lasses, news,
Gude news I have to tell,—
There's a boat ful o' lads
Come to our town to sell.
The wean wants a cradle,
An' the cradle wants a cod,
An' I'll no gang to my bed
Until I get a nod.
Father, quo' she, Mither, quo' she,
Do what you can,
I'll no gang to my bed
Till I get a man."—

ইত্যাদি আধা স্কচ্ ও আধা ইংরাজী ভাষায় হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু যখন হাস্য-পরিহাস নাই, গম্ভীরভাবের বর্ণনা করা হইতেছে, তখন তিনি বিশুদ্ধ ইংরাজীতে বলিতেছেন—

" Lives there a man so firm, who, while his heart
Feels all the bitter horrors of his crime,
Can reason down its agonising throbs,
And, after proper purpose of amendment,
Can firmly force his jarring thoughts to peace ?

O happy, happy, enviable man !
O glorious magnanimity of soul !"

সংস্কৃত সাহিত্যের অনুকরণের ফলে বাঙ্গালা সাহিত্যের লাভের কথা বলা হইল; এবার আমরা ক্ষতির কথা বলিব।

সংস্কৃত সাহিত্যের অনুকরণে বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্ষতি।

অনুকরণ মাত্রই দোষের নহে। বরং প্রথম অবস্থায় অনুকরণই শিক্ষার একমাত্র উপায়। কিন্তু এই অনুকরণ অতি মাত্রায় চলিলে, মানসিক শক্তির ব্যাঘাত অবশ্যম্ভাবী। বাঙ্গালা কবিগণ এই অনুকরণের মাত্রা এতদূর বাড়াইয়া তুলিয়াছিলেন যে, চিন্তা ও কল্পনা-শক্তির অনুশীলনে তাঁহাদের আদৌ অবসর ছিল না। কেবল বর্ণনীয় বিষয় নহে; ভাব, বর্ণনা সমস্তই তাঁহারা সংস্কৃতের রত্নভাণ্ডার হইতে অপহরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, হাতের কাছে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তৈয়ারি জিনিষ থাকিতে অনর্থক পরিশ্রম করিয়া নিকৃষ্ট দ্রব্য নির্ম্মাণের কি প্রয়োজন? কিন্তু একবারও ভাবিয়া দেখিলেন না যে, পরিশ্রম কখনও একেবারে বিফল হয় না, এবং অতিরিক্ত অনুকরণ মানসিক উন্নতির বিষম অন্তরায়। তাঁহাদের সেই অনুকরণ-স্পৃহা ক্রমে এমন বাড়িয়া উঠিল যে, পরবর্ত্তী কবি স্বয়ং সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডার লুণ্ঠনের আয়াস স্বীকার না করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী কবির উপর বাটপাড়ি আরম্ভ করিলেন। অনেক সময় বাটপাড়, চোরের অপেক্ষা অধিক যশস্বী হইতেন।

অনুকরণ কখন মার্জ্জনীয়।

সাহিত্য-সংসারে কে বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন—আমি কখনও কাহারও চুরি করি নাই? কিন্তু Penal Code এ

এ চুরির শাস্তি নাই। কারণ, সাহিত্য জাতীয় সম্পত্তি; কাহারও নিজস্ব নহে। একান্নবর্ত্তী হিন্দুপরিবারের সম্পত্তির ন্যায় যে কেহ নিজ শক্তিতে এই জাতীয় সম্পত্তির উন্নতিসাধন করেন, তিনি কেবল মাত্র স্বয়ং সেই উন্নতির ফল ভোগ করিতে পারেন না। স্বজাতীয় সকলেরই তাহাতে সমান অধিকার। কাজেই এ চুরি—চুরি নহে। তবে সুধী-সমাজ ইহার একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তুমি চুরি কর, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু সেই অপহৃত দ্রব্যের সদ্ব্যবহার করিতে না পারিলে, তোমার কপালে চোরের ছাপ মারিয়া দিব। তুমি যে শব্দ বা যে ভাবটি পূর্ব্ববর্ত্তী কবির গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিবে, তাহার উৎকর্ষ সাধন করিতে পার,—হীরকখণ্ডটিকে পালিশ করিয়া তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আরও শতগুণ বর্দ্ধিত করিতে পার, তাহাতে তোমাকে কেহ দোষ দিবে না; বরং সেই হীরকখণ্ডের আবিষ্কর্ত্তা অপেক্ষাও তুমি অধিকতর সম্মান লাভ করিবে; কিন্তু তুমি যদি তাহার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি দূরে থাকুক, অর্ব্বাচীনের ন্যায় ব্যবহার করিয়া তাহার গৌরব-হানি কর, তাহা হইলে তোমার দোষ অমার্জ্জনীয়। দুঃখের বিষয়, আমাদের প্রাচীন বাঙ্গালা কবিগণের অনেকেই এই অমার্জ্জনীয় অপরাধে অপরাধী।

সংস্কৃতানুকরণের ফলে বাঙ্গালা সাহিত্যে দোষের উদাহরণ।

সংস্কৃতের অযথা অনুকরণে ও পরবর্ত্তী কবিগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের রচনার যথেচ্ছ ব্যবহারে প্রাচীন বাঙ্গালা কবিতা সময়ে সময়ে কিরূপ হাস্য-জনক হইয়াছিল, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

সংস্কৃতজ্ঞ মাত্রেই কুমারসম্ভবে—

অতিরঞ্জন ও অস্বাভাবিকতা।

"সা রাজহংসৈরিব সন্নতাঙ্গী
গতেষু লীলাঞ্চিতবিক্রমেষু।

ব্যানীয়ত প্রত্যুপদেশলুব্ধৈ-
রাদিৎসুভির্নূপুরশিঞ্জিতানি ॥"

ইত্যাদি পার্ব্বতীর রূপবর্ণনা পাঠ করিয়াছেন। এই বর্ণনাতেই যথেষ্ট অতিশয়োক্তি হইয়াছে। তবে মহাকবির লিপিচাতুর্য্যে তাহা মানাইয়া গিয়াছে।

কবিকঙ্কণ এই বর্ণনার উপর আর একটু রং ফলাইলেন। তিনি বলিতেছেন—

"গৌরীর বদন শোভা লখিতে না পারি কিবা
দিনে চন্দ্র নাহি দেয় দেখা।
মলিন চাঁদ সেই শোকে, না বিচারি সর্ব্বলোকে
মিথ্যা কহে কলঙ্কের রেখা॥
গৌরীর দশন-রুচি দেখিয়া দাড়িম্ব বীচি
মলিন হইল লজ্জাভরে।
অনুমান করি মনে ঐ শোকের কারণে
পক্ককালে দাড়িম্ব বিদরে॥
স্থূলতা উদরে ছিল, বলে তা লুটিয়া নিল
উরঃস্থল জঘন দুজনে।
চরণ-চঞ্চল-ভাব লোচন করিল লাভ
নব নৃপ আসিতে যৌবনে॥"

ভারতচন্দ্র ইহার উপর আর একমাত্রা চড়াইলেন। কালিদাস ও কবিকঙ্কণ রাজহংসের গতির সহিত পার্ব্বতীর গমনের তুলনা করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র বলেন—

"যে জন না দেখিয়াছে বিস্থার চলন।
সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ॥"

কবিকঙ্কণ বলিতেছেন যে, গৌরীর বদন-শোভা দেখিয়া চাঁদ লজ্জায় দিনে দেখা দেয় না। ইহাতেও ভারতচন্দ্রের তৃপ্তি হইল না; তিনি বলিলেন—

"কি ছার শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদ নখে প'ড়ে তার আছে কতগুলা॥"

কালিদাসের সময়েও যাগ-যজ্ঞের প্রচলন ছিল। তাই নিত্যদৃষ্ট ক্ষীণাকার বেদীমধ্যের সহিত পার্ব্বতীর ক্ষীণ মধ্যদেশের তুলনা সহজেই তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল। কৃত্তিবাস মুষ্টিতে সীতার কাঁকালি ধরিতে পারিতেন। ভারতচন্দ্র ইঁহাদের উপরে উঠিয়াছেন:—

"কত সরু ডমরু-কেশরি-মধ্যথান।
হর-গৌরী-কর-পদে আছয়ে প্রমাণ॥
কে বলে অনঙ্গ-অঙ্গ দেখা নাহি যায়।
দেখুক সে আঁখি ধ'রে বিস্তার মাজায়॥"

কিন্তু রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রকেও হারাইয়াছেন:—

"কেহ বলে মধ্যস্থল নাহি কি রহস্য।
কেহ বলে দেবসৃষ্টি, থাকিবে অবশ্য॥"

এই সকল বর্ণনায় বঙ্কিম বাবুর আশমানির রূপবর্ণনার মূল দেখিতে পাওয়া যায়।

শিবের অপূর্ব্ব বরবেশ দর্শনে নারীদিগের মনের ভাব ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে:—

"দৃষ্ট্বা জামাতরং মেনা জহৌ শোকং মুদান্বিতা।
প্রশশংসুর্য্বতাশ্চ ধন্যো ধন্য ইতীরিতাঃ॥

দুর্গা ভাগ্যবতীত্যেবমূচুঃ কাশ্চন কন্যকাঃ।
ন দৃষ্টো বর ইত্যেবমস্মাভির্জ্ঞানগোচরে॥
কাশ্চিন্নিমেষরহিতা মূর্চ্ছামাপুশ্চ কাশ্চন।
নিনিন্দুঃ স্বপতিং কাশ্চিৎ স্বেচ্ছাং চক্রুশ্চ কাশ্চন
কাশ্চিদ্ভাবেন রুরুদুঃ পুলকাঞ্চিতবিগ্রহাঃ।
কামেন কাশ্চিৎ কামিন্যো মৌনীভূতাশ্চ স্তম্ভিতাঃ॥"

যাহা এখানে এইরূপে ইঙ্গিতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার উপর উত্তরোত্তর রংয়ের মাত্রা চড়াইয়া কবিকঙ্কণ, ঘনরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র নারীগণের পতিনিন্দারূপ যে জঘন্য ব্যাপারের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

এই অতিরঞ্জন ও অস্বাভাবিকতা কোন কোন সংস্কৃত কবির কাব্যে যথেষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং এই দোষটি তাঁহাদের নিকট হইতে প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়াছেন।

অতিরিক্ত অনুকরণের ফলে প্রাচীন কবিগণের উদ্ভাবনী শক্তির কি প্রকার হ্রাস হইয়াছিল, তাহা দেখাইতেছি। যেমন সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা কাব্যের কতকগুলি বাঁধাধরা বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, প্রাচীন বাঙ্গালা কবিদিগের মজলিশেও কাব্যরচনায় সেইরূপ কতকগুলি বাঁধাধরা বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। গ্রন্থের প্রারম্ভেই কতকগুলি দেবদেবীর স্তব, পরে সৃষ্টি-তত্ত্ব, শিবের বিবাহ, হরগৌরীর কোন্দল, কার্ত্তিক-গণেশের জন্ম প্রভৃতি পৌরাণিক বিষয়গুলি ত ছিলই, তাহার উপর প্রাসঙ্গিক হউক আর না হউক, রামায়ণ, মহাভারত বা কোন পুরাণ হইতে দীর্ঘ দীর্ঘ গল্পাংশ সকল লইয়া গ্রন্থমধ্যে সংযোজিত হইত। পূর্ব্বেই উক্ত হই-

অতিরিক্ত অনুকরণে উদ্ভাবনী শক্তির হ্রাস।

য়াছে যে, পৌরাণিক প্রসঙ্গ প্রাচীন বাঙ্গালীর বড় প্রিয় বস্তু ছিল, এবং প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য সকল কোন দেব-দেবীর পূজোৎসবোপলক্ষে লোকসমক্ষে গীত হইত। প্রাচীন কবিগণ লোকের মনোরঞ্জনার্থেই যে এইরূপ দীর্ঘ দীর্ঘ পৌরাণিক প্রসঙ্গ সকল গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট করিতেন, তাহা বুঝা যায়। তাহার উপর স্বয়ং মহর্ষি বেদব্যাস যখন রামায়ণের সুদীর্ঘ আখ্যায়িকা স্বীয় গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তখন বাঙ্গালা কবিরা ছাড়িবেন কেন? এক্ষণে মহাভারতের এ অংশ প্রক্ষিপ্ত বিবেচিত হইলেও প্রাচীন বাঙ্গালা কবিরা ইহাকে বেদব্যাসেরই লেখনীসম্ভূত বলিয়া মনে করিতেন। এ সকলের উপর প্রায় সকল কবির কাব্যেই অল্পাধিক পরিমাণে নারীগণের পতিনিন্দা, বারমাস্যা, বেসাতির হিসাব ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা থাকিত। আমরা এই গতানুগতিকতার কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

গতানুগতিকতার উদাহরণ।

প্রত্যেক রাজার রাজধানীতেই স্মৃতিশাস্ত্রানুযায়ী জাতিবিভাগ অবলম্বনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র জাতিগণকে বসাইতে হইবে, তাহার কোন ব্যতিক্রম চলিবে না। যদি কেহ বলেন যে, গ্রন্থ সকল মুসলমান রাজত্বকালে রচিত হইলেও, কবিগণ প্রাচীনতর হিন্দুসমাজেরই বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া তদানীন্তন বর্ণ-বিভাগের অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহার কথার উত্তর—

"পুরীর অন্তর গড়ে স্বতন্তর
বসিল যবন যত।

পাইয়া মর্য্যাদা কত মির্জাদা
সৈয়দ পাঠান কত ॥
সমরকুশল বসিল মোগল
সেখজাদা যত জনা।
পেলে এক রুটি সবে খায় বাঁটি
রণে পাশরে আপনা।" (ধর্ম্মমঙ্গল)

বালকগণের পাঠারম্ভ একইপ্রকার; এ বিষয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বণিকের ছেলের কোন প্রভেদ ছিল না। সকল স্থানেই সেই—

"কাব্য অলঙ্কার কোষ আগম নিগম।
ভক্তিযোগ সার যায় ঘুচে মনভ্রম ॥" (ধর্ম্মমঙ্গল)

এমন কি, পূর্ব্ববর্ত্তী কবি যে সকল ব্যক্তি বা স্থানের নাম দিয়াছেন, পরবর্ত্তী কবি স্বীয় গ্রন্থে তাহা অবিকল ব্যবহার করিয়াছেন, একটা নূতন নাম উদ্ভাবন করিবার আয়াসটি পর্য্যন্ত স্বীকার করেন নাই। ঘটকঠাকুর বা পুরোহিত হইলেই তাঁহার নাম জনাই ওঝা বা সোমাই ওঝা হইবে, হাট হইলেই তাহা গোলাহাট হইবে, বণিক্ বাণিজ্যযাত্রা করিলে তাঁহাকে "চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর" লইয়া "দক্ষিণ পাটনে" যাইতে হইবে; সেই ক্ষুদ্র ডিঙ্গাগুলি যদি জলে ডুবাইবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে স্বয়ং হনূমান্‌কে ডাকিতে হইবে। রামায়ণের অদ্ভুতকর্ম্মা বীর হনূমান্ বাঙ্গালী কবির নিকট deus ex machina হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহাদের ডাকাডাকিতে বীর একদণ্ডের জন্য সুস্থির হইয়া থাকিতে পারিতেন না। আমরা দেখিতে পাই, হনূমান্ স্বয়ং কোদালি ধরিয়া কাদা তুলিয়া কালকেতুর গৃহনির্ম্মাণে

কামিলা অর্থাৎ বিশ্বকর্ম্মার সহায়তা করিতেছেন; তিনিই সমুদ্রে ঝড় তুলিয়া সাধু ধনপতি ও চাঁদবেণের ডিঙ্গাগুলি জলে ডুবাইতে-ছেন; শেষে এমন হইয়াছে যে, অতি সামান্য কার্য্যের জন্যও তাঁহার সাহায্য না লইলে চলিতেছে না। চাঁদবেণে মনসার সহিত বিবাদে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া যখন জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য বন হইতে কাঠ কাটিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে যাইতেছেন, তখন মনসা দেখিলেন—সর্ব্বনাশ!

"কাষ্ঠ বেচি খাইয়া যদি সাধু যায় দেশে।
আমাকে দিবেক গালি যত মনে আসে॥" (মনসার ভাসান)

তখন নিরুপায় হইয়া সখীকে উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন সখী নিরুপায়ের উপায়, অগতির গতি, পবন-নন্দনের সহায়তা প্রার্থনা করিবার পরামর্শ দিলেন।

"নেত বলে বিষহরি যুক্তি কেন ভোল।
পবনের পুত্র হনু তার তরে বোল॥
হনূমান্ চাপুক উহার বোঝার উপরে।
এই বোঝা সাধু যেন লইতে না পারে॥
দেবীর আজ্ঞায় তবে হনূমান্ যায়।
আসিয়া বসিল চাঁদের কাষ্ঠের বোঝায়॥
কাষ্ঠ বোঝা ফেলে সাধু পড়ে ঘন পাকে।
ঘাড়ে হস্ত দিয়া সাধু বাপ্ বাপ্ ডাকে॥" (মনসার ভাসান)

যে বীর সাগর লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, গন্ধমাদন পর্ব্বত মস্তকে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, তাঁহাকে এই সকল সামান্য কার্য্যে নিয়োজিত দেখিলে আমাদের মনে কষ্ট হয়; কিন্তু আমাদের সর্ব্বা-

পেক্ষা অধিক কষ্ট হয়, যখন আমরা দেখি, বাঙ্গালী কবির অনুরোধে কপিবর কবিবর সাজিয়া হস্তে লেখনী ধারণপূর্ব্বক পুরাণ রচনায় নিমগ্ন হইয়াছেন; স্বয়ং বীরেরও বোধ হয় এ কার্য্য প্রীতিকর হয় নাই। হনুমানের ন্যায় বিশ্বকর্ম্মাকেও বাঙ্গালী কবিরা অনেক খাটাইয়া লইয়াছেন। কাহারও ডিঙ্গা, কাহারও গৃহ, কাহারও কঞ্চুলিকা, কাহারও ব্যজনী নির্ম্মাণ করিতে হইলেই বিশাইকে ডাক পড়িত। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বোধ হয় তখন বঙ্গদেশে শিল্পের তাদৃশ উন্নতি হয় নাই। কিন্তু আমরা ইহা সঙ্গত মনে করি না। মাটির ঘর প্রস্তুত করিবার লোকও কি তখন ছিল না যে, বিশ্বকর্ম্মা ও হনূমান্‌কে সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল? আমাদের বিশ্বাস, ইহা তদানীন্তন বাঙ্গালী কবিদিগের উদ্ভাবনী শক্তির দীনতার ও গতানুগতিকতার পরিচায়ক।

প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে বর্ণনায় পূর্ব্বাপর অসঙ্গতি।

পূর্ব্বোক্ত কারণে, অর্থাৎ সংস্কৃত সাহিত্যের অযথা অনুকরণ ও তজ্জনিত কল্পনাশক্তির দীনতার ফলে, প্রাচীন বাঙ্গালী কবিদিগের রচনায় আরও একটি মহৎ দোষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাঁহাদের রচনায় অনেক স্থলে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি দেখা যায় না। সংস্কৃত কবিরা সমাজের যে অবস্থায় বাস করিয়া তাঁহাদের কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, প্রাচীন বাঙ্গালী কবিগণ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থায় বাস করিতেন। তাঁহারা যে সকল ক্ষুদ্র গ্রামে বাস করিতেন, সে সব দেখিয়া,—

"স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিণাং গাং গতানাং
শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্।"

বলিয়া কস্মিন্ কালে কাহারও ভ্রম জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল না।

তাঁহারা সামান্য পল্লীগ্রামে, সামান্য গৃহে, সামান্য অবস্থার লোকের মধ্যে, সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। প্রকৃতির মহতী সৃষ্টির মধ্যে বাস করিলে সামান্য হৃদয়েও উচ্চভাবের উদয় হইতে পারে। বাঙ্গালী কবিকে ভগবান্ এ সুযোগও বড় দেন নাই। গ্রামের প্রান্ত-বাহিনী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী তাঁহাদের সমুদ্র, আম জাম প্রভৃতি গাছের বন তাঁহাদের দণ্ডকারণ্য, ক্ষুদ্র বৃক্ষবাটিকা তাঁহাদের নন্দন কানন। তাঁহাদের গ্রামের বা পার্শ্ববর্ত্তী অন্য গ্রামের কোন ভূম্যধিকারী তাঁহা-দের নিকট সার্ব্বভৌম নরপতি, ও কোন পল্লীসুন্দরী তাঁহাদের চক্ষে রতি বা তিলোত্তমা।

অত্যুচ্চ-কল্পনাশক্তিসম্পন্ন মহাকবিও সকল স্থলে দেশকালের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন না। যে সমাজে তিনি বাস করেন, অলক্ষিতে তাঁহার কাব্যে সে সমাজের ছায়া আসিয়া পড়ি-বেই। এই জন্যই যে Milton—

"Things unattempted yet in prose or rhyme"

বর্ণনা করিবেন বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছিলেন, তাঁহার কাব্যে—

"God the Father turns a school divine."

ক্ষীণ-কল্পনাশক্তিসম্পন্ন প্রাচীন বাঙ্গালী কবির ত কথাই নাই। আমাদের প্রাচীন কবিগণের বর্ণিত দেবতাদের মধ্যেও দম্পতি-কলহ আছে, ঘর-জামাইয়ের লাঞ্ছনা আছে, বহু বিবাহ আছে। অমর-রমণীরা দরিদ্র, বৃদ্ধ, অন্ধ, খঞ্জ, বধির, দুর্ম্মুখ পতিগণের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া স্বস্ব ভাগ্যের নিন্দা করেন। দেবগণেরও কেহ কেহ অর্থোপার্জ্জনে অক্ষম হওয়ায়, স্ত্রীর তাড়নায় জমিদারের নিকট হইতে মৌরসী স্বত্বে জমি লইয়া চাষ-বাসের চেষ্টা করেন, তৈজস-পত্র বাঁধা দিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করেন। কেহ এমন দরিদ্র যে, স্ত্রীকে এক

জোড়া শাঁখা কিনিয়া দিতে পারেন না, স্ত্রী সেই খেদে রাগ করিয়া ছেলে দু'টিকে সঙ্গে লইয়া বাপের বাড়ী চলিয়া যান। দেবতাদিগেরও ধোপা নাপিত আছে ; তবে জাত হারাইলে তাঁহাদের ধোপা নাপিত বন্ধ হইত কি না, জানা যায় নাই। তাঁহারাও নিমঝোল, শুক্তা, পল্‌তা ও ফুলবড়ি ভাজা, কুল ও কাসন্দির অম্বল খাইতে ভাল বাসিতেন ; ক্রমে অধিকতর সভ্য হইয়া "সঘৃত পলান্ন" পর্যন্ত ভক্ষণ করিয়া রসনার তৃপ্তি সাধন করিতেন। প্রাচীন বাঙ্গালী কবি সংস্কৃত কাব্য হইতে উচ্চ ভাব বা উচ্চ বর্ণনা ধার করিয়া লইলেও, তাঁহার কাব্যে তাঁহার সমাজের ছায়া আসিয়া পড়ায়, রচনায় অনেক স্থলে পূর্ব্বাপর বিরোধ ও অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডার হইতে সোণার থাল চাহিয়া লইয়া তাহাতে "বেতো শাক" ও পল্‌তা ভাজা খাইয়াছেন ; নানা অমূল্য রত্নাভরণ লইয়া বাগ্‌দিনীর অঙ্গে পরাইয়া দিয়াছেন ; মণিময় মর্ম্মর-প্রাসাদে ছেঁড়া কাঁথার শয্যা বিছাইয়াছেন। ইহা আমরা দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

মহর্ষি বাল্মীকির—

"লঙ্কা নাম সমুদ্রস্য মধ্যে মম মহাপুরী।
সাগরেণ পরিক্ষিপ্তা নিবিষ্টা গিরিমূর্দ্ধনি॥
সম্পূর্ণা রাক্ষসৈর্ঘোরৈর্যথেন্দ্রস্যামরাবতী॥
প্রাকারেণ পরিক্ষিপ্তা পাণ্ডুরেণ বিরাজিতা।
হেমকক্ষ্যা পুরী রম্যা বৈদূর্য্যময়তোরণা॥"

ইত্যাদি বর্ণনার অনুকরণে, কৃত্তিবাস—

"চিত্রকূট পর্ব্বতের উপর লঙ্কাপুরী।
শোভিতেছে স্বর্গ যেন ইন্দ্রের নগরী॥
কাঞ্চন স্ফটিক মণি রজতে নির্ম্মাণ।
পুরী-শোভা দেখিয়া বিস্মিত হনূমান্॥
চারিদিকে লঙ্কাপুরী বেষ্টিত সাগর।
দেবতার গতি নাহি লঙ্কার ভিতর॥
স্বর্ণের প্রাচীর মধ্যে, বাহিরে লোহার।
গগনমণ্ডলে চূড়া লেগেছে তাহার॥"—

রাবণের লঙ্কাপুরীর এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই কনক-লঙ্কাপুরীর দুর্জ্জয় অধিপতি রাবণ,—যাহার ভয়ে "দেবতার গতি নাহি লঙ্কার ভিতর"—

"হেন ছার যুদ্ধে আর নাহি প্রয়োজন।
থাকিব কপাট দিয়া প্রাণ বড় ধন॥
প্রবেশিতে লঙ্কাপুরে নাহি দিব বাট।
লঙ্কাপুরে চারিদ্বারে দেহ ত কপাট॥"

এই বলিয়া রামসৈন্যের ভয়ে দুয়ারে কপাট দিয়া লুকাইয়া রহিলেন। মন্ত্রী জাম্ববানের পরামর্শে একদিন রজনীযোগে বানরেরা পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া লঙ্কায় আগুন লাগাইয়া দিল,—

"এক এক বানর নিল দুই দুই মশাল।
অগ্নি দিয়া পোড়ায় লঙ্কার চালে চাল॥
অগ্নিতে পুড়িয়া পড়ে বড় বড় ঘর।
পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে লঙ্কার ভিতর॥

পর্ব্বতপ্রমাণ অগ্নি ভয়ঙ্কর দেখি।
পিঞ্জর সহিত পোড়ে পোষণীয়া পাখী ॥
নানা জাতি পোষা জন্তু পোড়ে পালে পালে।
প্রাণভয়ে কেহ বা পলায় উভরড়ে ॥"

এই অগ্নিকাণ্ড পাঠ করিলে মনে হয়, রাত্রিতে অতর্কিতভাবে দস্যুরা ফুলিয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়া গৃহে অগ্নিসংযোগপূর্ব্বক লুঠ-পাঠ করিতেছে। এ হিসাবে ইহা উৎকৃষ্ট বর্ণনা হইয়াছে; কিন্তু লঙ্কার পক্ষে হাস্যজনক। লঙ্কার রাজসভায় রাবণের সহিত অঙ্গদের বাগ্‌যুদ্ধ পাঠ করিলে মনে হয়, কৃত্তিবাসের গ্রামে বারোয়ারী তলায় দুইজন কবিওয়ালা পরস্পরকে বাক্যবাণের দ্বারা আক্রমণ করিতেছে। কালকেতুর ও কলিঙ্গভূপতির যুদ্ধবর্ণনা পাঠ করিলে কে না বুঝিবেন যে, পল্লীগ্রামের দুইজন সামান্য জমিদার পরস্পরের স্বত্ব রক্ষার জন্য লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিতে-ছেন, এবং পরাজিত ব্যক্তি প্রাণভয়ে লুকাইতেছেন?

কবির গ্রামের কোন ক্ষুদ্র মহাজন আপন-জমিতে উৎপন্ন ফসল দুই একখানি ক্ষুদ্র ডিঙ্গায় বোঝাই করিয়া গোড়াই বা দারকেশ্বর নদী বাহিয়া দুই চারি ক্রোশ দূরস্থিত কোন হাটে বিক্রয় করিতে যাইতেছে, ও সেই সকল দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য দ্রব্য লইয়া ফিরিতেছে; যাইবার সময় বা প্রত্যাগমন-কালে অকস্মাৎ ঝটিকা উত্থিত হইয়া মহাজনকে বিপন্ন করিতেছে; মহাজন ইষ্টদেবতা স্মরণ করিয়া অতি কষ্টে ধন প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করিতেছে;—ইহাই ধনপতির বাণিজ্যযাত্রা-চিত্রের আদর্শ। সমুদ্র, সিংহল, সেতুবন্ধ—এ সকল ধার-করা কথা।

রামায়ণে সীতার অগ্নি-পরীক্ষার কথা আছে, সুতরাং কবিকঙ্কণ খুল্লনার অগ্নি-পরীক্ষা করাইলেন; ইহা সঙ্গত কি অসঙ্গত হইল, তাহা ভাবিয়া দেখিলেন না।

কবি রামেশ্বর কুমারসম্ভব হইতে হিমালয়ের বর্ণনা, শিবের ও গৌরীর তপস্যা ইত্যাদি ধার করিয়া তাঁহার কাব্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিলেন। কিন্তু তিনি বোধ হয় যদুপুরের বাগ্‌দীপাড়ার নিকট বাস করিতেন; এইজন্য কালিদাসের—

অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহ-
মপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধা-
ন্নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্॥

এই মহাযোগী শিবমূর্ত্তির কল্পনা ধারণা করিতে না পারিয়া তাঁহার কাব্য শিবায়নে এক শিবে বাগ্‌দীকে নায়ক করিয়া বসিয়াছেন। সে বাগ্‌দী মাঠের ধারে সামান্য কুঁড়ে ঘরে বাস করে, হেল্যো গরু লইয়া জমি চাষ করে, ও রাত্রে মশারির অভাবে সর্ব্বাঙ্গে সর্ষপতৈল মর্দ্দন করিয়া মশকদংশন নিবারণ করে। আর তাহার স্ত্রী—"হেমু দোলই"এর কন্যা গৌরী বাগ্‌দিনী——

"মাঠে মাঠে মাছ মারি হাটে হাটে বেচে।"

বর্ণনায় পূর্ব্বাপর বিরোধের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আর হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রকৃত কবিত্ব।

কিন্তু এ সকল ত্রুটি সত্ত্বেও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রকৃত কবিত্বের অভাব নাই। এ হিসাবে ইহা জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সকলের সহিত সমান আসন গ্রহণে সমর্থ। কিন্তু এ কথা বুঝিবার

পূর্ব্বে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, কবিতার উদ্দেশ্য কি?

কবিতার উদ্দেশ্য—সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি

সাহিত্য-সমাজে অনেকে অনেক রকমে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। কিন্তু কবিতার প্রধান উদ্দেশ্য যে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি, এ বিষয়ে বোধ হয় মতদ্বৈধ নাই। পূজ্যপাদ বঙ্কিমবাবু তাঁহার উত্তর-রাম-চরিতের সমালোচনায় বলিয়াছেন ঃ—

"সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। সৌন্দর্য্য অর্থে কেবল বাহ্য প্রকৃতির বা শারীরিক সৌন্দর্য্য নহে। সকল প্রকারের সৌন্দর্য্য বুঝিতে হইবে। যাহা স্বভাবানুকারী নহে, তাহাতে কুসংস্কারাবিষ্ট লোক ভিন্ন কাহারও মন মুগ্ধ হয় না। এজন্য স্বভাবানুকারিতা সৌন্দর্য্যের একটি গুণ মাত্র—স্বভাবানুকারিতা ছাড়া সৌন্দর্য্য জন্মে না।

এই জগৎ ত সৌন্দর্য্যময়—তাহার প্রতিকৃতিমাত্রই সৌন্দর্য্যময় হইবে। তবে কেন বলিয়াছি যাহা প্রকৃতির প্রতিকৃতিমাত্র, সে সৃষ্টিতে কবির তাদৃশ গৌরব নাই? ইহার কারণ, সে কেবল প্রতিকৃতি—অনুলিপিমাত্র—তাহাকে সৃষ্টি বলা যায় না। যাহা সতের প্রতিকৃতিমাত্র নহে, তাহাই সৃষ্টি। যাহা স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি। তাহাতেই চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়।"

এই সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি দ্বারা কবি পাঠকের কতকগুলি চিত্তবৃত্তিকে উত্তেজিত করেন। ইহাকে কবির রসোদ্ভাবনী শক্তি বলা যাইতে পারে। চিত্তবৃত্তি উত্তেজিত না হইলে কোন কার্য্য হয় না। যাঁহারা জগতের শ্রেষ্ঠ কবি, তাঁহারা মনুষ্যের চিত্তবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়া মানুষকে উচ্চ উদার ভাবে অনুপ্রাণিত করিবার চেষ্টা

করেন। এইরূপ উচ্চ ভাবে অনুপ্রাণিত উন্নত মনুষ্যের দ্বারা জগতে মহৎ কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। নীরস নীতিবাক্য বা কঠোর রাজশাসন দ্বারা যে উদ্দেশ্য সাধিত না হয়, কবির সরস সৌন্দর্য্যময়ী সৃষ্টির দ্বারা তাহা সাধিত হইয়া থাকে। এই জন্যই জগতে প্রকৃত কবিদিগের এত আদর। তাঁহারা জগতের শিক্ষা-দাতা—গুরু।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি ও রসোদ্ভাবনী শক্তির উদাহরণ।

প্রাচীন বাঙ্গালী কবিগণের এই সৌন্দর্য্যসৃষ্টি ও রসোদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় তাঁহাদের গ্রন্থের অনেক স্থলে পাওয়া যায়। আমরা নিম্নে দুই একটি মাত্র উদাহরণ দিতেছি।

চণ্ডী, ব্যাধ কালকেতুকে ধন দিবার উদ্দেশ্যে, মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহার কুটীরে আসিয়া উপস্থিত। কালকেতু তখন হাটে গিয়াছে; তৎপত্নী দুঃখিনী ফুল্লরাও নিজ সইএর নিকট হইতে কিছু চাউল ধার করিয়া আনিবার জন্য বহির্গত হইয়াছে। কুটীরে প্রত্যা-গত হইয়া ফুল্লরা দেবীকে দেখিয়া চমৎকৃতা হইল; পরে প্রণাম করিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। দেবী বলিলেন,—"আমি ব্রাহ্মণকন্যা, গৃহে সপত্নীযন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তুমি যদি অনুমতি দাও, তাহা হইলে তোমার গৃহে কিছুদিন বাস করি।"

"এতেক বাক্য হৈল যদি অভয়ার তুণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে ফুল্লরার মুণ্ডে॥
হৃদে বিষ মুখে মধু জিজ্ঞাসে ফুল্লরা।
দূর হৈল ক্ষুধা তৃষ্ণা রন্ধনের ত্বরা॥"

ফুল্লরা ভাবিল, এরূপ অপূর্ব্বরূপযৌবনসম্পন্না রমণীকে গৃহে স্থান দিলে ক্রমশঃ তাহার প্রতি স্বামীর অনাদর অবশ্যম্ভাবী। অতএব ইহাকে গৃহ হইতে তাড়াইতে হইবে। এই ভাবিয়া ফুল্লরা চতুরতার সহিত সহানুভূতি-ব্যঞ্জক স্বরে বলিল—"আহা তোমার ত বড় কষ্ট! তা' চল, আমি তোমার সহিত তোমাদের বাটীতে যাইতেছি, সেখানে যাইয়া তোমার শাশুড়ী ননদ প্রভৃতিকে অনেক তিরস্কার করিব ও নানা প্রকারে বুঝাইয়া আসিব।"

দেবী মনে মনে হাসিয়া দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় বলিলেন,—

"দারুণ দৈবের গতি, দরিদ্র আমার পতি,
পঞ্চমুখে গালি পাড়ে কোপে।
বিষকণ্ঠ মোর স্বামী, সহিতে না পারি আমি,
তনু শুকাইল সেই তাপে॥
খাও পর যত তুমি, সকল যোগাব আমি,
আমাকে ত না বাসিহ ভিন্।
সমকালে সমভাগে, থাকিব বীরের আগে,
আজি হৈতে সম্পদের চিন্॥"

কিন্তু ফুল্লরা দরিদ্রা হইলেও—"খাও পর যত তুমি, সকল যোগাব আমি"—দেবীর এ প্রলোভন-বাক্যে ভুলিল না। সে পূর্ব্বাপেক্ষা রুক্ষস্বরে বলিল—

"তোরে আমি বলি ভাল, স্বামীর বসতি চল,
পরিণামে পাবে বড় দুখ।
শুন হের মূঢ়মতি, যদি ছাড় নিজ পতি,
কেমতে তরিবে লোকমুখ॥

স্বামী বনিতার পতি, স্বামী বনিতার গতি,
স্বামী বনিতার সে বিধাতা।
স্বামীই পরম ধন, স্বামী বিনে অন্যজন,
কেহ নহে সুখ-মোক্ষ-দাতা॥"

ফুল্লরা রামায়ণ মহাভারতাদি হইতে অনেক নীতিবাক্যও শুনাইল; শেষে বলিল—

"যদি সতিনী কোন্দল করে, দ্বিগুণ বলিবে তারে,
অভিমানে ঘর ছাড় কেনি।
কোপে করি বিষপান, আপনি ত্যজিবে প্রাণ,
সতীনের কিবা হবে হানি॥"

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; দেবী স্থির ভাবে উত্তর করিলেন—

"শুন গো তোমারে বলি ফুল্লরা সুন্দরী।
আইলাম বীরের দুখ দেখিতে না পারি॥
আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে।
আনিল তোমার পতি বান্ধি নিজ গুণে॥
হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ যায়া বীরে।
যদি বীর বলে তবে যাব স্থানান্তরে॥
আইলাম তোমার ঘর হিত করিবারে।
কত না নিষ্ঠুর কথা বল বারে বারে॥
তুমি যে বল সে বল আমি বীরে না ছাড়িব।
দিয়া আপনার ধন দুঃখ নিবারিব॥"

"আনিল তোমার পতি বান্ধি নিজ গুণে।"—ফুল্লরা এই

দ্ব্যর্থাত্মক বাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না। দেবী যে কালকেতুকে ছলনা করিবার জন্য কাননে সুবর্ণ-গোধিকা-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন ও কালকেতু তাঁহাকে ধরিয়া ধনুতে বাঁধিয়া আনিয়াছিল, ফুল্লরা তাহা জানিত না। সে ভাবিল, বোধ হয় এই রমণী তাহার স্বামীর অনুগৃহীতা, বা তাহার স্বামী এই রমণীর অনুগৃহীত। দারুণ দুঃখে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সে তখনও আশা ছাড়িল না; আপনার বারমাসের দুঃখকাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিল। ভাবিল, তাহার দুঃখের কথা শুনিলে রমণীর দয়া হইতে পারে, ও কালকেতুর দারিদ্র্যের বিষয় অবগত হইলে সে চলিয়া যাইতে পারে। ফুল্লরার দুঃখও ত সামান্য নহে,—

"শ্রাবণে বরিষে ঘন দিবস রজনী।
সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি॥
আচ্ছাদন নাহি, অঙ্গে পড়ে মাংস-জল।
কত মাছি খায় অঙ্গে মোর কর্ম্মের ফল॥
শুন গো শুন গো রামা দুঃখের কাহিনী।
কত শত খায় জোঁক নাহি খায় ফণী।"

কিন্তু এ চেষ্টাও ব্যর্থ হইল। দেবী সকল শুনিয়া বলিলেন, "আর তোমার দুঃখ থাকিবে না। আমার যথেষ্ট ধন আছে, তুমি তাহার অংশভাগিনী হইবে।"

তখন ফুল্লরা নিরুপায় হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হাটে স্বামীর নিকট গমন করিল। কালকেতু পত্নীর অবস্থা দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহাকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল; বলিল—

"শাশুড়ী ননদী নাহি, নাহি তোর সতা।
কার সনে কোন্দল করি চক্ষু কৈলি রাতা॥"

তখন ফুল্লরা দারুণ দুঃখে, ক্রোধে, অভিমানে, বলিল—

"সতাসতী নাহি প্রভু তুমি মোর সতা।
এবে ফুল্লরারে হৈল বিমুখ বিধাতা॥
কি লাগিয়া প্রভু তুমি পাপে দিলা মন।
আজি হৈতে হৈলা প্রভু লঙ্কার রাবণ॥
পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে।
কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে॥"

কালকেতু এ অভিযোগের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র, ফুল্লরাও তাহা জানে। সুতরাং তাহার চরিত্রের উপর এইরূপ অনুচিত দোষারোপে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। কিন্তু ফুল্লরা যখন বলিল, "আমার কথা সত্য কি মিথ্যা, ঘরে আসিয়া দেখ," তখন সে আর কোন কথা না কহিয়া গৃহে চলিল।

"দূর হৈতে দেখে বীর আপনার বাসে।
তিমির ফেটেছে যেন তপন-তরাসে॥
ভাঙ্গা কুঁড়িয়া খান করে ঝলমল।
পূর্ণিমার চন্দ্রে যেন আকাশমণ্ডল॥"

এইবার কালকেতুর চরিত্র-পরীক্ষা হইবে। কালকেতু অশিক্ষিত ব্যাধ; তখন তাহার পূর্ণ যৌবন; তাহার উপর সে দরিদ্র। এরূপ অবস্থায় এক অলোকসামান্যা সুন্দরী যুবতী স্বেচ্ছায় তাহার কুটীরে আসিয়াছে, তাহার গৃহে বাস করিতে চাহিতেছে, নিজের অমূল্য রত্নরাশি তাহার হস্তে তুলিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে। অশিক্ষিত দরিদ্র মৃগাজীব এ প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিবে কি? কবিকঙ্কণ

তাহার হস্ত অবশ হইল, বাগ্‌রোধ ঘটিল, ও বল বুদ্ধি নষ্ট হইয়া গেল। তখন দেবী আত্মপরিচয় দিলেন—

"আইলাম পার্ব্বতী তোমারে দিতে বর।
লহ বর কালকেতু, ত্যজ ধনুঃশর॥
মাণিক অঙ্গুরী লহ সাত রাজার ধন।
ভাঙ্গায়ে বসাহ পুর গুজরাট-বন॥"

যেমন পরীক্ষা, তেমনই বর দান। অথবা আমাদের মনে হয়, কালকেতু যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, তাহার উপযুক্ত পুরস্কার বুঝি জগতে হইতে পারে না।

ধর্ম্মমঙ্গলে বর্ণিত কুমার লাউসেনের পরীক্ষা, কালকেতুর পরীক্ষার ন্যায় অত সুন্দর-কবিত্বসম্পন্ন না হইলেও, তাহাতে লাউসেন-চরিত্রের মহত্ত্ব এরূপ প্রখ্যাপিত হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা শ্রেষ্ঠ কাব্যের উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। এখানেও অম্বিকা মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কুমার লাউসেনের চরিত্রবল পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। সে মূর্ত্তি দেখিয়া দেবতারাও ত্রস্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু মর্ত্ত্য যুবকের চরিত্র সেই পরীক্ষায় অনলদগ্ধ সুবর্ণের ন্যায় অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল।

বাঙ্গালা সাহিত্যের বেহুলা-চরিত্র পাঠ করিলে, বণিগ্‌-নন্দিনী বণিগ্‌-বধূ বেহুলাকে অকুণ্ঠিতচিত্তে রাজনন্দিনী সীতা ও সাবিত্রীর পার্শ্বে বসাইতে পারা যায়। কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাস বাঙ্গালীর আধ্যাত্মিক চরিত্র গঠনে যেরূপ সহায়তা করিয়াছেন, এরূপ আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বাহুল্যভয়ে আমরা প্রবন্ধের এ অংশের আর বিস্তৃতি করিব না। যাহা বলা হইয়াছে, বোধ হয়

তাহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, আদর্শ চরিত্র সৃষ্টিবিষয়ে প্রাচীন বাঙ্গালী কবিরা অনেক স্থলেই অসামান্য কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

স্বভাবানুগত বর্ণনা।

কেবল স্বভাবানুগত বর্ণনাতেও তাঁহাদের কৃতিত্ব অল্প নহে। ভাঁড়ুদত্ত, মুরারি শীল, দুর্ব্বলা দাসী, কর্ণসেন ইত্যাদি এক একটি সুন্দর সজীব চিত্র। মুরারি শীলের ছবি শব্দচিত্রে অদ্বিতীয়। কালকেতু দেবী-প্রদত্ত একটি অঙ্গুরী বেণের বাড়ীতে ভাঙ্গাইতে গিয়াছে।

"বেণে বড় দুষ্টশীল, নামেতে মুরারি শীল,
লেখা জোখা করে টাকা কড়ি।
পাইয়া বীরের সাড়া, প্রবেশে ভিতর পাড়া,
মাংসের ধারয়ে দেড় বুড়ি॥

খুড়া খুড়া ডাকে কালকেতু।
কোথা হে বণিক্‌রাজ, আছয়ে বিশেষ কাজ,
আমি আইলাম তার হেতু॥
বীরের বচন শুনি, আসি বলে বেণেনী,
আজি ঘরে নাহিক পোদ্দার।
সকালে তোমার খুড়া গেল খাতকের পাড়া,
কালি দিব মাংসের উধার॥

আজি কালকেতু যাও ঘর।
কাষ্ঠ আনিহ একভার, একত্র শুধিব ধার,
মিষ্ট কিছু আনিহ বদর॥

শুন গো শুন গো খুড়ি, কিছু কার্য্য আছে তড়ি,
অঙ্গুরী ভাঙ্গায়া নিব কড়ি।
আমার জোহার খুড়ি, কালি দিহ বাকি কড়ি,
যাই অন্য বণিকের বাড়ী॥

কালু, এক দণ্ড কর বিলম্বন।
সহাস্য বদনে বাণী বলে বেণে-নিতম্বিনী,
দেখি বাপা অঙ্গুরী কেমন॥
ধনের পাইয়া আশ, আসিতে বীরের পাশ
ধায় বেণে খিড়কীর পথে।
মনে বড় কুতূহলী, কান্ধেতে কড়ির ঝুলি,
হড়্পী তরাজু লয়া হাতে॥

করে বীর বেণেকে জোহার।
বেণে বলে ভাইপো, এবে নাহি দেখি তো,
তোমার কেমন ব্যবহার॥
খুড়া, উঠিয়া প্রভাত কালে, কাননে এড়িয়া জালে,
হাতে শর চারি প্রহর ভ্রমি।
ফুল্লরা পসরা করে, সন্ধ্যাকালে যাই ঘরে,
এই হেতু নাহি দেখ তুমি॥

খুড়া, ভাঙ্গাইব একটি অঙ্গুরী।
হ'য়ে মোরে অনুকূল, উচিত করিবে মূল,
তবে সে বিপদে আমি তরি॥
বীর দেয় অঙ্গুরী, বেণিয়া প্রণাম করি,
জোখে বেণে চড়ায়া পৈড়ান।

কুঁচ দিয়া কৈল মান ষোল রতি দুই ধান,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

অঙ্গুরী ওজন করা হইল, এবার দরের কথা।

"সোণা রূপা নহে বাপা, এ বেঙ্গা পিতল।
ঘসিয়া মাজিয়া বাপু ক'রেছ উজ্জ্বল ॥
রতি প্রতি হৈল বীর দশ গণ্ডা দর।
দুই ধানের কড়ি তায় পাঁচ গণ্ডা ধর
অষ্ট পণ পাঁচ গণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ি।
মাংসের পিছিলা ধার ধারি দেড় বুড়ি ॥
একত্র হৈল অষ্ট পণ আড়াই বুড়ি।
চা'ল ক্ষুদ কিছু লহ, কিছু লহ কড়ি ॥
অঙ্গুরীর মূল্য শুনি ব্যাধের নন্দন।
ভাবে—অঙ্গুরী সমান মিথ্যা সপ্তঘড়া ধন ॥
কালকেতু বলে খুড়া মূল্য নাহি চাই।
যে জন দিয়াছে বস্তু দিব তার ঠাঁই ॥
বেণে বলে লহ বাপু বাড়ানু পঞ্চ বট।
আমার সনে সওদা করিতে না পাবে কপট ॥
ধর্ম্মকেতু দাদা সনে কৈনু লেনাদেনা।
তাহা হৈতে ভাইপো বড়ই সিয়ানা ॥
কালকেতু বলে খুড়া না কর ঝগড়া।
অঙ্গুরী লইয়া যাই অন্য বণিকের পাড়া ॥
হাত বদল করিতে বেণের হৈল মনে।
পদ্মাবতী সনে মাতা হাসেন গগনে ॥"

কেমন সুন্দর, স্বাভাবিক বর্ণনা! ধর্ম্মমঙ্গলের কর্ণসেন-চরিত্রও যেমন স্বাভাবিক, তেমনই কৌতুককর। কবিকঙ্কণের ভাঁড়ু দত্তের সহিত কর্ণসেনের একটু সাদৃশ্য আছে। ভাঁড়ু দত্ত গোপনে কালকেতুর বিরুদ্ধে কলিঙ্গ-ভূপতিকে উত্তেজিত করিয়া উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধাইল; যুদ্ধে পরাজিত, লুক্কায়িত কালকেতুকে বিশ্বাসঘাতকতা-পূর্ব্বক ধরাইয়া দিল। শেষে যখন দেবীর বরে উভয় রাজার মধ্যে সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইল ও কালকেতু পুনরায় গুজরাট রাজ্যের অধিপতিত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন, তখন ধূর্ত্ত ভাঁড়ু রাজপ্রসাদ লাভের উদ্দেশে কালকেতুর পরম হিতাকাঙ্ক্ষী সাজিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইল; বলিল—

"খুড়া, (কালকেতু প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি হইলেও ভাঁড়ু তাঁহাকে খুড়া সম্বোধন করিত) এই যে যুদ্ধবিগ্রহাদি হইয়া গেল ও তুমি এত কষ্ট পাইলে, তাহাতে দুঃখের কারণ কিছুই নাই। ইহাতে তোমার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইল। তুমি পূর্ব্বে গুপ্ত ভাবে থাকিতে, এখন স্বয়ং কলিঙ্গভূপতি তোমাকে রাজা বলিয়া ঘোষিত করিলেন। পূর্ব্বে লোকে তোমার ধনপ্রাপ্তি-বিষয়ে কত কথা বলিত, এখন আমার চেষ্টায় তোমার সে নিন্দা ঘুচিল। কলিঙ্গরাজ তোমাকে বন্দী করিয়াছিলেন; কিন্তু—

"যখন দুই প্রহর নিশা, করি রাজ-সম্ভাষা
অনেক বুঝাইনু নরপতি।
ধরিয়া রাজার পায় খণ্ডিনু সকল দায়,
খুড়ী জানয়ে মোর মতি॥
যেই আপন হয়, সেই কভু পর নয়,
আপন জানিবে ভাঁড়ু দত্তে।

রাজসভাতে বাণী আমি সে বলিতে জানি,
ভাঁড়ু দত্ত বিদিত জগতে ॥

খুড়া—

তুমি হইলা বন্দী, অনুক্ষণ আমি কান্দি,
বধূ তোমার নাহি খায় ভাত।
দেখিয়া তোমার মুখ পাসরিনু সব দুখ,
দশ দিক্ হইল অবদাত ॥
হইয়া লোকের চূড়া সিংহাসনে থাক খুড়া,
আমাকে রাজ্যের লাগে ভার।
থাকহ পুরাণ শুনি, রাজ্য জানে আমি জানি,
নফরে করহ ব্যবহার ॥"

কিন্তু ভাঁড়ুদত্তের চরিত্র কালকেতুর নিকট আর অবিদিত ছিল না। তাই তিনি, তাহার ধূর্ত্ততার পুরস্কারস্বরূপ, তাহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া, দুই গালে চূণকালী দিয়া, নগর হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দিবার আদেশ দিলেন।

ধর্ম্মমঙ্গলের কর্পূরসেনও বড় কম লোক নহেন। অমন কাপুরুষ স্বার্থপর লোক অতি বিরল। কর্পূর দেশপর্য্যটনে ভ্রাতা লাউসেনের সহচর। কিন্তু যেখানে যখনই লাউসেন বিপন্ন, কর্পূর তাঁহার সহায়তা করা দূরে থাকুক্, "আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি"—এই মহানীতিবাক্য স্মরণপূর্ব্বক ঝড়ের পূর্ব্বেই আত্মরক্ষায় সচেষ্ট। মিথ্যা অভিযোগে লাউসেন জামতি নগরে কারাগারে বন্দী। কর্ণসেন প্রাণভয়ে কোথায় যে পলাইয়াছে, তাহা কেহ জানে না। শেষে যখন ধর্ম্মের জয় হইল, নিরপরাধ লাউসেন রাজসম্মানে

সম্মানিত হইলেন, তখন কর্পূর হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত।

"কর্পূর বলেন যবে বন্দী হ'লে ভাই।
রাতারাতি গৌড় গিয়াছিনু ধাওয়া-ধাই॥
রাজারে আশ্বাস করি জামতি লুঠিতে।
ল'য়ে আসি লক্ষ সেনা পথে আচম্বিতে॥
পথে শুনি বিজয়, বিদায় দিনু ভাই।
লাউসেন বলে তোরে বলিহারি যাই॥"

ভাঁড়ুদত্ত ও কর্পূরের পরিণাম একরূপ হইলেই সুখের বিষয় হইত।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে পল্লীচিত্র।

এতদ্ভিন্ন, প্রাচীন বাঙ্গালী কবিগণ সে কালের যে সকল পল্লীচিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদায় বাস্তবিকই উপাদেয়। সেই সকল চিত্র প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যকে বাঙ্গালীর প্রাণের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছে। বঙ্কিমবাবু ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার সমালোচনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"আজিকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে সমারূঢ় সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময় বোধ হয়—হৌক সুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের, আমাদের নহে। খাঁটি বাঙ্গালী কথায়, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না।...এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না—জন্মিবার যো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই। বাঙ্গালার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে, খাঁটি বাঙ্গালী কবি আর জন্মিতে পারে না। আমরা বৃত্রসংহার পরিত্যাগ করিয়া পৌষ-

পার্ব্বণ চাই না। কিন্তু তবু বাঙ্গালীর মনে পৌষপার্ব্বণে যে একটা সুখ আছে—বৃত্রসংহারে তাহা নাই। পিঠাপুলিতে যে সুখ আছে, শচীর বিম্বাধর-প্রতিবিম্বিত সুধায় তাহা নাই।”

সুধী সমালোচকের এই সমীচীন কথাগুলি হইতে আমরা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব অনেকটা বুঝিতে পারি। প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য পল্লীগ্রামের ইতিহাস।

একটি পার্থক্য সহজেই আমরা উপলব্ধি করিতে পারি ;—প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য বাঙ্গালার পল্লীগ্রামের, পল্লীজীবনের ইতিহাস ; আধুনিক বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যে বাঙ্গালী-জীবনের কথা দেখিতে পাই না। তাহার কারণ, সে কালের কবি ও এ কালের কবির আদর্শ বিভিন্ন ; সুতরাং উভয়ের সৌন্দর্য্য-বোধেরও তারতম্য ঘটিয়াছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রাচীন কবি যেখানে সৌন্দর্য্য দেখিতেন, আধুনিক কবি সেখানে সৌন্দর্য্য দেখিতে পান না। প্রাচীন কবি বাঙ্গালীর চণ্ডীমণ্ডপে, রন্ধনশালায়, পুষ্করিণীর ঘাটে, শ্যামল শস্যক্ষেত্রে, কাব্যে বর্ণনার উপযোগি সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইতেন। নারীগণ কলসী-কক্ষে যখন পুষ্করিণী হইতে জল আনিতেন, বা রন্ধনশালায় রন্ধনে নিযুক্ত থাকিতেন, বা বিবাহক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া পরস্পর প্রাণ খুলিয়া হাস্য পরিহাস বা স্বস্ব ভাগ্যের নিন্দা করিতেন, এমন কি, যখন সতীনে সতীনে কোন্দল করিয়া পাড়ার লোককে অস্থির করিয়া তুলিতেন, তখন প্রাচীন বাঙ্গালী কবি তাঁহাদিগকে বড়ই সুন্দর দেখিতেন। আধুনিক কবি এ সকল স্থলে বড় সৌন্দর্য্য খুঁজিয়া পান না। তিনি সৌন্দর্য্যের অন্বেষণে কখনও লঙ্কার রাজসভায়, কখনও ইন্দ্রের নন্দন-

বনে, কখনও বা কুরুক্ষেত্র বা প্রভাস তীর্থে ছুটেন; বীরাঙ্গনা প্রমীলা, গর্ব্বস্ফীতা ঐন্দ্রিলা, মূর্ত্তিমতী পরার্থপরতা সুভদ্রার সৌন্দর্য্যই তাঁহার নিকট আদর্শ সৌন্দর্য্য। আধুনিক কবির রুদ্রপীড়, অভিমন্যু, প্রাচীন কবির কালকেতু ও লাউসেনের স্থান অধিকার করিয়াছে। সম্প্রতি স্রোত যেন একটু ফিরিয়াছে। আধুনিক কবিদিগেরও কেহ কেহ "আমের বনের ঘ্রাণে পাগল" হন; "ভরা ক্ষেতে মধুর হাসি" দেখিতে পান, এবং "ধেনুচরা মাঠ ও ছায়ায় ঢাকা পল্লীবাটের" সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হন। কিন্তু এ দেখায় আর সে দেখায় অনেক প্রভেদ আছে। যাহা গিয়াছে, তাহা আর ফিরিবার নহে।

পদাবলী-সাহিত্য।

আমরা এতক্ষণ প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের (গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি তখন হয় নাই) একটি শাখারই, অর্থাৎ আখ্যান-কাব্যেরই আলোচনা করিলাম। এক্ষণে প্রাচীন বাঙ্গালার পদাবলী-সাহিত্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। এই পদাবলী বাঙ্গালা সাহিত্যে একটি অতি গৌরবের বস্তু। উপরে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের যে সকল ত্রুটির কথা বলা হইয়াছে, পদাবলী সে সকল দোষসংস্পৃষ্ট নহে।

পদাবলী প্রায়শঃ রাধাকৃষ্ণ-বিষয়িণী।

এক রামপ্রসাদের কালীবিষয়ক পদাবলী ভিন্ন প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য পদাবলীই রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ে রচিত। বাঙ্গালীর হৃদয় চিরদিনই প্রেমপ্রবণ। রাধাকৃষ্ণের প্রেমে বাঙ্গালীর হৃদয় যেরূপ আলোড়িত, উন্মথিত হইয়াছে, এমন বুঝি আর কিছুতেই হয় নাই। বাঙ্গালা দেশের আদি কবি জয়দেব তাই তাঁহার "মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলী" সরস্বতীকে "শ্রীবাসুদেব-রতি-কেলি-কথা"র বর্ণনায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাই বাঙ্গালা ভাষার আদি কবি চণ্ডীদাস—

"শ্রীরাধা-গোবিন্দ-কেলি-বিলাস ভাষল বিবিধ মতে।
কবিবর চারু নিরুপম মহী ব্যাপিল যাহার গীতে॥"

তাহার পর যখন শ্রীগৌরচন্দ্র নবদ্বীপাকাশে উদিত হইয়া তাঁহার প্রেমসুধারস সমগ্র ভারতবাসীকে পান করাইতে লাগিলেন, তখন তাহারা দেখিল, ইহা সেই আস্বাদিতপূর্ব্ব কৃষ্ণপ্রেমসুধা। সেই সুধাপানে মত্ত হইয়া গভীর উন্মাদনায় বাঙ্গালী কবি আবার কৃষ্ণপ্রেম-গীত—গৌরাঙ্গপ্রেম-গীত গাহিতে লাগিলেন। তাঁহার কল্পনা-নেত্রে নবদ্বীপপ্রান্তবাহিনী রজতধবলা সুরধুনী বৃন্দাবনবাহিনী নীল-সলিলা কালিন্দীরূপে, ও শচীর দুলাল গৌরচন্দ্র যশোদা-জীবন-ধন কৃষ্ণচন্দ্ররূপে প্রতিভাত হইলেন।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি।

বাঙ্গালা সাহিত্যে কৃষ্ণপ্রেম-অবলম্বনে পদাবলী-রচনার প্রথম পথপ্রদর্শক চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি মৈথিল কবি ছিলেন, এই জন্য অনেকে তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষার কবি বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত নহেন; কিন্তু তাঁহার প্রভাব বাঙ্গালী কবির উপর এতই পতিত হইয়াছে, ও তাঁহার রচনার অনুকরণে এত বাঙ্গালা কবিতা রচিত হইয়াছে যে, বাঙ্গালী কবিগণের তালিকা হইতে সহজে তাঁহার নাম উঠাইয়া দেওয়া যায় না। এই উভয় কবি একই বিষয়ের বর্ণনায় স্বস্ব কবিত্বশক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন; কিন্তু উভয়েরই রচনা-পদ্ধতি বিভিন্ন। আমি কেবল ভাষার বিভিন্নতার কথা বলিতেছি না। সম্মুখে আগ্নেয়-গিরি দেখিতেছি; সুপ্ত-গিরির হৃদয়ে আন্দোলন, আলোড়ন আরম্ভ হইয়াছে; সেই আভ্যন্তরীণ আন্দোলনের চিহ্ন গিরির বহিরঙ্গেও প্রকটিত হইয়াছে। যদি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস এই আগ্নেয়-গিরির বর্ণনা করিতেন, তাহা হইলে মৈথিল কবি অতি নিপুণতার সহিত পুঙ্খানু-

পুঙ্খরূপে ইহার বাহ্য পরিবর্ত্তন সকল লক্ষ্য করিয়া তাহাদের একটি অতি মনোজ্ঞ বিবরণ প্রদান করিতেন; কিন্তু বাঙ্গালী কবির দৃষ্টি বাহ্য পরিবর্ত্তনে আকৃষ্ট হইত না। তিনি উহা অগ্রাহ্য করিয়া গিরির অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিতেন, সেথায় কি প্রবল অগ্নি-তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে। মোটামুটি বলিতে গেলে, বিদ্যাপতি বহির্জগতের কবি, চণ্ডীদাস অন্তর্জগতের কবি; বিদ্যাপতি শব্দ-সম্পদে অদ্বিতীয়, ভাবগাম্ভীর্য্যে চণ্ডীদাসের আসন বিদ্যাপতির অনেক উচ্চে। বিদ্যাপতি শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি, রূপ প্রভৃতির যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অমূল্য। কিন্তু তাঁহার—

"অপরূপ পেখনু রামা।
কনক-লতা অবলম্বনে উয়ল
হরিণহীন হিমধামা॥"

কিংবা—

"শৈশব যৌবন দুহুঁ মেলি গেল।
শ্রবণক পথ দুহুঁ লোচন নেল॥
বচনক চাতুরী লহু লহু হাস।
ধরণীয়ে চাঁদ করত পরকাশ॥"

কিংবা—

"সজনি, ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমালা সঞে তড়িত লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥"

এ সকলই শ্রীরাধার বহিরঙ্গের বর্ণনা; রাধার হৃদয়-সমুদ্রে যে তরঙ্গ উঠিয়াছিল, বিদ্যাপতি তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই,

পারিলেও তাহা কবিত্বের তূলিকায় ভাল ফুটাইতে পারেন নাই। চণ্ডীদাস সে হৃদয়-সমুদ্রের সংবাদ রাখিতেন, তাই কিরূপে শ্যামনাম রাধার কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া তাঁহার প্রাণ আকুল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। তাই তিনি রাধার অন্তরের ব্যথার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ;—

"রাধার কি হ'লো অন্তরে ব্যথা !
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে,
না শুনে কাহারও কথা ॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে,
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে,
যেমন যোগিনী পারা ॥
এক দিঠ করি ময়ূর-ময়ূরী-
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয়, নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে ॥"

পরবর্ত্তী বৈষ্ণব পদকর্ত্তৃগণের রচনায় এই উভয় পদ্ধতিই দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের কেহ কেহ বিদ্যাপতির অনুকরণে, কেহ কেহ বা চণ্ডীদাসের পদাঙ্কানুসরণে পদরচনা করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত কবিগণের মধ্যে গোবিন্দদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ; শেষোক্তগণের মধ্যে জ্ঞানদাস, নরোত্তম দাস প্রভৃতি কবিগণের নাম বিশেষ পরিচিত। আমরা তুলনায় সমালোচনার জন্য এই উভয়শ্রেণীর কবিতার দুই একটি মাত্র এ স্থলে উদ্ধৃত করিব। যথা গোবিন্দদাস—

"কাঞ্চন-কমল-কান্তি-কলেবর,
বিহরই সুরধুনী-তীর।
তরুণ অরুণ জনু, তরু হেরি তোড়ই,
কুন্দকুসুম করবীর॥
সমবয় সকল সখাগণ-সঙ্গহি,
সরস রভস রসে ভোর।
গজবর-গমন গঞ্জি গতি মন্থর,
গোপতে গদাধর কোর॥
অপরূপ গৌরাঙ্গ-রঙ্গ।
পুরব-প্রেম-পরমানন্দে পূরিত,
পুলক-পটলময় অঙ্গ॥
নিরুপম-নদীয়া-নগর-পুর নিতি নিতি
নব নব করত বিলাস।
দীনে দয়া করু, তুরিত দুঃখ হরু,
কহতহি গোবিন্দ দাস॥"

ভাবগাম্ভীর্য্য বা প্রকৃত কবিত্বের হিসাবে উদ্ধৃত পদটি দীন হইলেও, কবি এরূপ কৌশল-সহকারে শব্দগুলি গাঁথিয়াছেন যে, উহা শ্রবণ বা পাঠমাত্র কাণে এক মধুর ঝঙ্কার তুলিয়া দেয়; উত্তমরূপে অর্থগ্রহ না হইলেও উহা শ্রবণ করিবার আকাঙ্ক্ষা দূরীভূত হয় না। কিন্তু ওরূপ কবিতার ঝঙ্কার কাণেই থাকিয়া যায়, উহা "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিতে" পারে না। এক-একজন কবি এইরূপ শব্দের ঝঙ্কারে মুগ্ধ করিতে অদ্বিতীয়-শক্তিশালী। Coleridgeএর কোনও কবিতা সম্বন্ধে একজন সমালোচক বলিয়াছেন:—

"To me, when I cannot follow him, there is always a fine ring, like bell-chimes, in his melody ; not unlike our best nursery rhymes. I like Coleridge's Kubla Khan for its exquisite cadence. That whole passage beginning—

'In Xanadu did Kubla Khan
A stately pleasure-dome decree :
Where Alph, the sacred river, ran
Through caverns measureless to man
Down to a sunless sea'—

has a most fascinating melody. I don't know what it means, but it's very fine."

(John Duncan, Colloquia Peripatetica.)

বিদ্যাপতি ও তাঁহার অনুকারী কবিগণের কবিতা পাঠ করিলেও সময়ে সময়ে মনে হয় —"অর্থ না বুঝি, কিন্তু বড় সুন্দর !"

এই কবিতার পর জ্ঞানদাস, নরোত্তম দাস প্রভৃতির কবিতা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা এক নূতন ও উচ্চতর শ্রেণীর কবিতা। ইহা শব্দের ঝঙ্কার তুলিয়া শ্রবণ মুগ্ধ করিতে পারুক আর না পারুক, কিন্তু ইহা মর্ম্মস্পর্শিনী ; কবি যেন পাঠকের প্রাণের কথাই ব্যক্ত করিতেছেন। যথা জ্ঞানদাস—

"রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরাণ।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ॥

চন্দন চাঁদের মাঝে মৃগমদে ধান্ধা।
তার মাঝে হিয়ার পুতলী রৈল বান্ধা॥
জাতি কুল শীল সব হেন বুঝি গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল॥
কুলবতী সতী হৈয়া দুকুলে দিনু দুখ।
জ্ঞানদাস কহে, দড় করি থাক বুক॥"

কিংবা নরোত্তম দাস—

"হে গোবিন্দ গোপীনাথ,
কৃপা করি রাখ নিজ পথে।
কাম ক্রোধ ছয় গুণে লৈয়ে ফিরে নানাস্থানে,
বিষয় ভুঞ্জয়ে নানা মতে॥
হইয়া মায়ার দাস করি নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থলাভ এই আশে কপট-বৈষ্ণব-বেশে
ভ্রমিয়া বুলি যে ঘরে ঘরে॥
অনেক দুঃখের পরে লৈয়াছিলে ব্রজপুরে,
কৃপা-ডোর গলায় বাঁধিয়া।
দৈব-মায়া বলাৎকারে খসাইয়া সেই ডোরে
ভবকূপে দিল ফেলাইয়া॥
পুনঃ যদি কৃপা করি এ জনার কেশে ধরি
টানিয়া তোলহ ব্রজভূমে।
তবে সে দেখি যে ভাল, নহে বোল ফুরাইল,
কহে দীন দাস নরোত্তমে॥"

এ সকল কবিতার তুলনা নাই। যতদিন বাঙ্গালা সাহিত্য থাকিবে, এই সকল পদের গৌরবের কোনও অংশে হ্রাস হইবে না।

রামপ্রসাদ।

রামপ্রসাদের কালী-বিষয়ক পদাবলীও বাঙ্গালীর বড় আদরের জিনিস। ভক্ত কবি সহজ চলিত ভাষায় তাঁহার হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি কখনও অভিমানী সন্তানের ন্যায় দেবীকে নির্দ্দয়, হৃদয়হীন বলিয়া তিরস্কার করিতেছেন; বলিতেছেন—"আর তোমাকে মা বলিয়া ডাকিব না; সন্তানের প্রতি তোমার যত ভালবাসা, তাহা বুঝিয়াছি।" কখনও সগর্ব্বে বলিতেছেন—

"আমি কি দুখেরে ডরাই।
ভবে দেও দুখ মা, আর কত চাই॥"

কখনও আপনাকে আপনি দোষী করিয়া কাঁদিতেছেন—

"আমি কাজ হারালাম কালের বশে।
গেল দিন মিছে রঙ্গরসে॥"

কখনও আবার সমস্ত দোষ "শ্যামা মায়ের" স্কন্ধে চাপাইতেছেন—

"মন-গরীবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা যেম্নি নাচাও তেম্নি নাচে॥"

আবার কখনও আনন্দে, আশায় উৎফুল্ল হইয়া গাহিতেছেন—

"মন রে শ্যামা মাকে ডাক।
ভক্তি মুক্তি করতলে দেখ॥

পরিহরি ধনমদ, ভজ পদ-কোকনদ,
কালেরে নৈরাশ কর, কথা শুন কথা রাখ ॥
কালী কৃপাময়ী নাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম,
অষ্ট যামের অর্দ্ধযাম, আনন্দেতে সুখে থাক ॥
রামপ্রসাদ দাস কয়, রিপু ছয় কর জয়,
মার ডঙ্কা, ত্যজ শঙ্কা, দূর ছাই ক'রে হাঁক ॥"

বাঙ্গালা সাহিত্যে রামপ্রসাদের স্থান লইয়া মতদ্বৈধ আছে। ভক্তির হিসাবে, আধ্যাত্মিকতার হিসাবে, রামপ্রসাদের পদাবলী অমূল্য। তাঁহার ভাবগাম্ভীর্য্যও যথেষ্ট আছে। কিন্তু কেবল ভাব-গাম্ভীর্য্যে উচ্চশ্রেণীর কবিতা হয় না। শ্রেষ্ঠ কবিদিগের ভাব-প্রকাশের এক রীতি আছে। রচনা সেই রীত্যনুসারিণী না হইলে, তাহা ভাব-সম্পদে সম্পন্ন হইলেও, তাহাকে উচ্চাঙ্গের কবিতা বলা যায় না। কোন একটি বিশেষ লক্ষণের দ্বারা এই রীতি বুঝাইবার উপায় নাই। ইহা বুঝাইবার জিনিস নহে; বুঝিবার জিনিস। অবিরত উচ্চশ্রেণীর কবিতা পাঠ করিতে করিতে ইহা আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়। তাই তীক্ষ্ণদর্শী সাহিত্য-সমালোচক Matthew Arnold বলিয়াছেন :—

বাঙ্গালা সাহিত্যে রামপ্রসাদের স্থান।

"Indeed there can be no more useful help for discovering what poetry belongs to the class of the truly excellent, and can therefore do us most good, than to have always in one's mind lines and expressions of the great masters, and to apply them as a

touchstone to other poetry. * * * * Short passages, even simple lines, will serve our turn quite sufficiently."

আবার—

"Critics give themselves great labour to draw out what in the abstract constitutes the characters of a high quality of poetry. It is much better simply to have recourse to concrete examples ;—to take specimens of poetry of the high, the very highest quality, and to say : The characters of a high quality of poetry are what is expressed *there*. They are far better recognised by being felt in the verse of the master, than by being perused in the prose of the critic."

(Matthew Arnold : Essays in Criticism).

কোনও কোনও সমালোচকের মতে রামপ্রসাদের রচনা শ্রেষ্ঠ কবিদিগের রীত্যনুসারিণী নহে। তাঁহারা বলেন,—রামপ্রসাদের—

"মাগো তারা ও শঙ্করী।
কোন্ অবিচারে, আমার উপরে, ক'ল্লি দুঃখের ডিক্রিজারি॥
এক আসামী, ছয়টা প্যাদা, বল্ মা কিসে সামাই করি।
আমার ইচ্ছা করে, ঐ ছটারে, গরল খাইয়ে প্রাণে মারি॥

পঙ্গদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার করালি নিলাম-সারি।
ঐ যে পাণ বেচে খায় কৃষ্ণ পান্তি, তারে দিলি জমিদারি ॥"

ইত্যাদি গীতের সহিত চণ্ডীদাসের—

"এ কুলে ও কুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল পায় ॥"

কিংবা কবিকঙ্কণের—

"দূর হৈতে দেখে বীর আপনার বাসে।
তিমির ফেটেছে যেন তপন-তরাসে ॥"

ইত্যাদি কবিতাংশগুলির তুলনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, রামপ্রসাদের উক্ত গীতের আধ্যাত্মিক ভাব যতই গভীর হউক না কেন, কবিত্বের হিসাবে উহার স্থান চণ্ডীদাস ও কবিকঙ্কণের কবিতার অনেক নিম্নে।

এই জন্য রামপ্রসাদের পদাবলী অন্য বিষয়ে মনোজ্ঞ হইলেও, উহাদিগকে তাঁহারা উচ্চ শ্রেণীর কবিতা বলিয়া গণনা করেন না। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা অসম্ভব।

আমরা এবার সংক্ষেপে বৈষ্ণব কবিদিগের প্রণীত চৈতন্যচরিত-গুলির আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান নিবন্ধের উপসংহার করিব। চৈতন্য-চরিতগুলির মধ্যে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবত, কৃষ্ণদাস কবি

চৈতন্য-চরিতাবলী।

রাজের চৈতন্য-চরিতামৃত, ও লোচনদাসের চৈতন্য-মঙ্গল বিশেষ প্রসিদ্ধ। তদ্ভিন্ন, গোবিন্দদাস ও মুরারি গুপ্ত প্রভৃতির করচারও আদর আছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, চৈতন্য-চরিতাখ্যায়কগণ চৈতন্যকে কৃষ্ণের অবতাররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহাদের গ্রন্থে অনেক অতিপ্রকৃতিক ঘটনার বর্ণনা দৃষ্ট হয়। ভক্তকবিগণ চৈতন্যদেবকে যে চক্ষে দেখিতেন, জগৎকে তাহাই দেখাইবার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন। কবিত্বের হিসাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে এই গ্রন্থগুলির স্থান বড় উচ্চ নহে। এই সকল কবির অনেকেরই "পদ্য কেবল চৌদ্দয় চেনা যায়।"

"এই মত প্রভু নিজ সেবক চিনিয়া।
জিজ্ঞাসেন ফাঁকি, সভে যায়েন হারিয়া॥
শ্রীবাসাদি দেখিলেও ফাঁকি জিজ্ঞাসেন।
মিথ্যাবাক্যব্যয়-ভয়ে সভে পলায়েন॥"

(চৈতন্য-ভাগবত)

ইত্যাদি পদ্যকে কবিতা বলা যায় না। যদি গদ্যে গ্রন্থরচনার রীতি সে সময়ে প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় ইঁহারা পদ্যে গ্রন্থরচনা করিতেন না।

ইহাদের মধ্যে সংস্কৃত-শ্লোক-বাহুল্য।

প্রত্যেক চরিত-গ্রন্থই তিন খণ্ডে বিভক্ত — আদি, মধ্য ও অন্ত্য। আদি খণ্ডে চৈতন্যের জন্মাবধি গয়াযাত্রা-প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত, মধ্য খণ্ডে কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ পর্য্যন্ত, এবং অন্ত্য বা শেষ খণ্ডে তাঁহার নানা-তীর্থ-পর্য্যটন ও পরিশেষে নীলাচলে ভক্তগণ সহ অবস্থিতি পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণ চৈতন্য-

জীবনের প্রত্যেক ঘটনা শ্রীমদ্ভাগবতাদি সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ হইতে শ্লোক তুলিয়া সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এরূপ করিবার, বোধ হয়, তাঁহাদের দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম, হিন্দু নিতান্ত শাস্ত্র-বিশ্বাসী; শাস্ত্র-বচনের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত না হইলে চৈতন্যের অবতারত্ব বিষয়ে লোকের বিশ্বাস বদ্ধমূল না হইতে পারে, এই আশঙ্কায় তাঁহারা বিশাল হিন্দুশাস্ত্রের যেথানে তাঁহাদের অনুকূল যে শ্লোক দেখিয়াছেন, তাহাই স্বস্ব গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গালা গ্রন্থ যে কখনও পণ্ডিতগণের আদরণীয় হইবে, বা শ্রীমদ্ভাগবতাদি ধর্ম্মগ্রন্থের সহিত সমান আসন অধিকার করিবে, ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই; অথচ বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ রচনা না করিলে চৈতন্য-প্রচারিত ধর্ম্ম সাধারণের অধিগম্য হইবে না। এইজন্য তাঁহারা প্রধানতঃ বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে স্বরচিত বা শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত অনেক সংস্কৃত শ্লোকের যোজনা করিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃতেই সংস্কৃত শ্লোকের বিশেষ বাহুল্য লক্ষিত হয়, এবং এই গ্রন্থ বাঙ্গালার পণ্ডিতসমাজে বিশেষ আদৃত। যে বাঙ্গালী সংস্কৃতাধ্যাপক এখনও বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন, তিনি কেবল সুন্দর সংস্কৃত-শ্লোক-সংযুক্ত হওয়ার জন্য সাদরে চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে বৈষ্ণব কবিদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এক হিসাবে এই সংস্কৃত-শ্লোক-বাহুল্য তাঁহাদের রচনায় দোষ ঘটাইয়াছে। একে ত ইহা দ্বারা পদে পদে রসভঙ্গ ও পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়া থাকে; তাহার উপর কোনও কোনও স্থলে বাস্তবিকই সন্দেহের উদয় হয় যে, গ্রন্থ-বর্ণিত বিষয় কোনও শ্লোকের অনুরোধে রচিত, বা সেই বিষয় সপ্রমাণ করিবার জন্যই শ্লোক উদ্ধৃত।

কিন্তু এ সকল ত্রুটি সত্ত্বেও এই চরিত-গ্রন্থসকল অতি উপাদেয়। ইহারা বাঙ্গালা ভাষায় আদি জীবন-চরিত। বাঙ্গালী কবি পুরাণের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া, এই সকল গ্রন্থে কাব্য-রচনার এক নূতন পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। যদিও বৈষ্ণব কবিগণ চৈতন্যকে কৃষ্ণের অবতাররূপে বর্ণনা করায়, তাঁহাদের রচনায় সময়ে সময়ে অতিরঞ্জন ও অতিপ্রকৃতিকতা আসিয়া পড়িয়াছে, তথাপি স্বাভাবিকতাই তাঁহাদের গ্রন্থের বিশেষত্ব। আমরা ঐ অতিরঞ্জন ও অতিপ্রকৃতিকতা সহজেই পরিত্যাগ করিতে পারি; এবং উহা পরিত্যাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা এত সুন্দর যে, তদ্দ্বারা হৃদয় আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। চৈতন্যের বাল্যের চপলতা, কৈশোরের বিদ্যানুরাগ ও বিদ্যাগর্ব্ব, যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থার উদ্বেল প্রেমোচ্ছ্বাস প্রভৃতি এরূপ সুন্দর সজীবভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহা পাঠমাত্রে যেন আমরা সেই মহাপুরুষকে আমাদের সম্মুখে দেখিতে পাই। বাহুল্যভয়ে আমরা গোবিন্দদাসের করচা হইতে কেবল একটিমাত্র স্থান এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। যখন চৈতন্য সন্ন্যাস অবলম্বনপূর্ব্বক গৃহত্যাগ করিয়া একমাত্র ভৃত্য গোবিন্দদাসকে সঙ্গে লইয়া দেশপর্য্যটন করিতেছেন, ও আপামর সাধারণকে হরিনাম বিলাইতেছেন, তখন একদিন বটেশ্বরে তীর্থরাম-নামক একজন ধনী, তাঁহার চরিত্র পরীক্ষা করিবার জন্য সত্যবাই ও লক্ষ্মীবাই-নাম্নী দুইজন বেশ্যাকে লইয়া তাঁহার নিকট আসিলেন।

ইহারা বাঙ্গালা সাহিত্যে আদি জীবনচরিত।

"ধনীর শিক্ষায় সেই বেশ্যা দুইজন।
প্রভুরে বুঝিতে বহু করে আয়োজন॥

তীর্থরাম মনে মনে নানা কথা বলে ।
সন্ন্যাসীর তেজ এবে হ'রে লব ছলে ॥
কত রঙ্গ করে লক্ষ্মী, সত্যবালা হাসে ।
সত্যবালা হাসিমুখে বসে প্রভুপাশে ।"

কিন্তু নবীন সন্ন্যাসী তাহাদিগকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়া—

"কেন অপরাধী কর আমারে জননি ।
এইমাত্র বলি প্রভু পড়িলা ধরণী ॥
খসিল জটার ভার ধূলায় ধূসর ।
অনুরাগে থরথর কাঁপে কলেবর ॥
সব এলোথেলো হ'লো প্রভুর আমার ।
কোথা লক্ষ্মী, কোথা সত্য, নাহি দেখে আর ॥
নাচিতে লাগিলা প্রভু বলি হরি হরি ।
রোমাঞ্চিত কলেবর অশ্রু দরদরি ॥
আছাড়িয়া পড়ে নাহি মানে কাঁটা খোঁচা ।
ছিঁড়ে গেল কণ্ঠ হ'তে মালিকার গোছা ॥
না খাইয়া অস্থি চর্ম্ম হইয়াছে সার ।
ক্ষীণ অঙ্গে বহিতেছে শোণিতের ধার ॥
ইহা দেখি সেই ধনী মনে চমকিল ।
চরণতলেতে পড়ি আশ্রয় লইল ॥
বড়ই পাষণ্ড মুই বলে তীর্থরাম ।
কৃপা করি দেহ মোরে প্রভু হরিনাম ॥
তীর্থরাম-পাষণ্ডেরে করি আলিঙ্গন ।
প্রভু বলে তীর্থরাম তুমি সাধুজন ॥

পবিত্র হইনু আমি পরশি তোমারে।
তুমি ত প্রধান ভক্ত কহে বারে বারে॥"

এরূপ স্থল বৈষ্ণব কবিদিগের গ্রন্থে বিস্তর আছে।

যে চরিতগ্রন্থে বর্ণনীয় চরিত্রটি সজীব ভাবে চিত্রিত হইয়া থাকে, সেই গ্রন্থের গৌরব অধিক। আমরা দেখিতে পাই, অধিকাংশ জীবনী-গ্রন্থই বর্ণিত মৃত ব্যক্তিদিগের ন্যায় প্রাণহীন। চরিত-লেখক মৃত ব্যক্তির জীবনের কতকগুলি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা সামাজিক, রাজনীতিক ইত্যাদি তথ্য সকল আবিষ্কার করিবার, বা সেই সকল তথ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এরূপ গ্রন্থকে জীবনী না বলিয়া আমরা ইতিহাস বলিতে পারি। Boswell-প্রণীত জনসনের জীবনী একটি প্রকৃত জীবনচরিত। Boswellএর গ্রন্থখানি পাঠ করিলে আমরা বৃদ্ধ জন্‌সন্‌কে আমাদের চক্ষের সমক্ষে দেখিতে পাই; তিনি জীবদ্দশায় যেমন মানুষটি ছিলেন, আমরা ঠিক সেই-রূপই তাঁহাকে দেখি। বৈষ্ণব কবিদিগের চৈতন্য-চরিতগুলিও পাঠ করিলে আমরা চৈতন্য-চরিত্রের একটি সজীব চিত্র দেখিতে পাই। এই হিসাবে, কবিত্ব-সম্পদে বিশেষ সম্পন্ন না হইলেও, এই গ্রন্থগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থায়ি ও উচ্চ স্থান লাভ করিবে।

আমরা বর্ত্তমান নিবন্ধের আর বাহুল্য করিব না। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতির স্থূল তত্ত্বগুলি সংক্ষেপে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। অল্প শক্তি লইয়া একটি অতি বিশাল ও গুরু বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আশা করি, তাহা সুধী-সমাজে মার্জ্জনীয় হইবে। উচ্চে উঠিতে সকলেরই ইচ্ছা হয়। পক্ষিরাজ নিজ শক্তিবলে আকাশের যত উচ্চ প্রদেশে উঠিতে পারে, চটক

তাহা পারে না। কিন্তু ভগবান্ তাহাকে উঠিবার যে প্রবৃত্তি দিয়াছেন, তাহা ত দমন করিবার সামর্থ্য তাহার নাই। তাহার যতদূর শক্তি, সে ততদূর উঠিবেই। তাই বৈষ্ণবকবি চৈতন্য-চরিত্রের আলোচনার বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, সেই কথায় বলি—

"পক্ষী যেমন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যত শক্তি থাকে ততদূর উড়ি যায়॥
এই মত চৈতন্য-কথার অন্ত নাই।
যার যত শক্তি সবে তত তত গাই॥"